মাটির কান্না

মাটির কান্না

জসীমউদ্‌দীন

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
কলিকাতা • ঢাকা

মেরি মিলফোর্ড

জয়যুক্তাসু

তুহীন তুষার শ্বেতদ্বীপের মণিমানিকের ঘরে,
আমার দেশের নক্সী কাঁথাটি ধরিয়া মেলন করে ;
কোন সে স্বপন মাধুরী হেরিয়া হাসিছ সোনার মেয়ে,
এদেশের কথা শুনাইব তাই তোমারে নিকটে পেয়ে।

সূচীপত্র

মাটির কান্না

মাটির কান্না তোমরা শুনিতে পাও ?
আমি শুনি গহন নিশীথে কাঁদে এই মূক মাটি।
আকাশে তারারা শত আঁখি মেলি জাগিয়া চাহিয়া থাকে,
রাত-জাগা পাখী রাতের আঁধার খণ্ডিত করি ডাকে।
সহস্র সুরে ঝিঁঝির কণ্ঠে কেঁদে ওঠে মূক মাটি,
তারি তালে তালে স্তব্ধতা যেন ভেঙে পড়ে ফাটি ফাটি।
যারা ঘুমায়েছে গহন মাটির ঘরে,
যুগের যুগের সঞ্চিত ব্যথা জমায়ে বুকের পরে,
তারা জেগে উঠে, মাটির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে গায়,
তাদের কান্না কেঁপে কেঁপে ওঠে দূর নভ-তারকায়।

মাটির কান্না কেউ কি শুনিতে পায় ?
আঁধারের কেশ এলায়ে বাতাসে কাঁদে এই মাটি হায়!
কাঁদে এই মাটি, আমি শুধু শুনি মাটিতে এ বুক পাতি,
মাটির বুকের স্পন্দন শুনি জাগিয়া দীঘল রাতি।
কাঁদে এই মাটি তাহাদের তরে, কাঁদিতে যারা না জানে,
সহস্র মারে ক্ষত-বিক্ষত যারা শাসনের বাণে।
গহন নিশীথে জ্যান্ত হইয়া কাঁদে এই মূক মাটি,
উন্মাদিনী সে নখরে নখরে আপনার বুক কাটি ;

কবর হইতে তুলিয়া তুলিয়া মৃত ছেলেগুলি তার,
জোনাকী আলোয় পড়ে পড়ে দেখে কাহিনী কি লেখা কার।
রে শিশু মুকুল ঝরেছিস তুই কোন অনাদরে হায়,
শিথিল বাহুর বন্ধনে কাঁদে শুষ্ক-স্তন্য মায়।
খেতের ফসলে মরাই ভরিয়া বুলবুলিদের ঘরে,
তুই এসেছিস অভিমানী ছেলে গলেতে যে ফাঁস পরে।
অভাগিনী জায়া সন্তানগুলি বক্ষে জড়ায়ে হায়,
ক্ষুধার অনল জ্বালায়ে রয়েছে মরণ প্রতীক্ষায়।

গহন নিশীথে এই মূক মাটি কাঁদে,
গ্রহ-পথে খসে তারাগুলি সেই উন্মাদিনীর নাদে।
পাতাল হইতে হুঙ্কারে নাগ, সহস্র ফণা মেলে,
যুগের যুগের সঞ্চিত বিষে নাচিতেছে শ্বাস ঢেলে।
আসমান বেয়ে উঠিছে সে নাগ, বিস্তারি ফণা-জাল,
কালকূট বিষে বিষায়ে তুলিছে আজিকার মহাকাল।
ফণায় তাহার নাচিছে ঝঞ্ঝা, শ্বাসেতে অশনি ঝলে,
মহাত্রাস যেন ঠিকরি উঠিছে ঘর্ষণে জ্বলে জ্বলে।

দেশ

খেতের পরে খেত চলেছে, খেতের নাহি শেষ,
সবুজ হাওয়ায় দুলছে ও কার এলো মাথার কেশ।
সেই কেশেতে গয়না পরায় প্রজাপতির ঝাঁক,
চঞ্চুতে জল ছিটায় সেথা কাল কাল কাক।
সাদা সাদা বক্-কনেরা রচে সেথায় মালা,
শরৎ কালের শিশির সেথা জ্বালায় মাণিক আলা
তারি মায়ায় থোকা থোকা দোলে ধানের ছড়া,
মার আঁচলের পরশ যেন সকল অভাব-হরা।
সেই ফসলে আসমানীদের নেইক অধিকার,
জীর্ণ পাঁজর বুকের হাড়ে জ্বলছে হাহাকার।

বনের পরে বন চলেছে বনের নাহি শেষ,
ফুলের ফলের সুবাস ভরা এ কোন্ পরীর দেশ?
নিবিড় ছায়ায় আঁধার করা পাতার পারাবার,
রবির আলো খণ্ড হয়ে নাচছে পায়ে তার।
সুবাস ফুলের বুনোট করা বনের লিপিখানি,
ডালের থেকে ডালের পরে ফিরছে পাখী টানি।
কচি কচি বনের পাতা কাঁপছে তারি সুরে,
ছোট ছোট রোদের গুঁড়ো তলায় নাচে ঘুরে।

মাথার পরে কালো কালো মেঘরা এসে ভেড়ে,
বুনো হাতীর দল এসেছে আকাশখানি ছেড়ে।
এই বনেতে আসমানীদের নেইক অধিকার,
জীর্ণ পাঁজর বুকের হাড়ে জ্বলছে অনাহার।

নদীর পরে নদী গেছে নদীর নাহি শেষ,
কত অজান গাঁ পেরিয়ে কত না-জান দেশ।
সাত সাগরের পণ্য চলে সওদাগরের নায়,
সুধার ধারা গড়িয়ে পড়ে গঞ্জ নগর ছায়।
চখায় মুখর বালুর চরা হাসে কতই তীরে,
ফুলের বনে রঙিন হয়ে যায় বা কভু ধীরে ;
কত মিনার সৌধ চূড়ার কোল ঘেঁসিয়া যায়,
কত সহর হাট বন্দর বাজার ফেলে বায়।
কত নায়ের ভাটিয়ালীর গানে উদাস হয়ে,
নদীর পরে নদী চলে কোন অজানায় বয়ে।
সেই নদীতে আসমানীদের নেইক অধিকার,
জীর্ণ পাঁজর বুকের হাড়ে জ্বলছে হাহাকার।

(কবি মহিউদ্দীনের একটি কবিতার অনুসরণে।)

নতুন কবিতা

রামধনুরে ধরতে পারি রঙের মায়ায়,
ধরব না তা ;
বিজলী এনে ভরতে পারি রঙের খাঁচায়,
আনব না তা।
আকসী দিয়ে পাড়তে পারি চাঁদের চুমো,
ছড়ার নূপুর বাজিয়ে তোমায় করতে পারি ঘুমোঘুমো ;
পাতালপুরীর রাজকন্যে সাত মাণিকের প্রদীপ জ্বালি,
ঘুম ঘুমিয়ে ঘুমের দেশে ঘুমলী স্বপন হাসছে খালি ;
এসব কথা ছড়ায় গেঁথে বলতে পারি,
বলব না তা ;
পাখীর পাখায় লিখন তারে লিখতে পারি,
লিখব না তা ;
লিখব আজি তাদের কথা, কথা যারা বলতে নারে,
এক শ' হাতে মারছে যাদের সমাজ নীতি হাজার মারে।

না ফুটিতে পড়ছে ঝরে শিশু-কুসুম যাদের কোলে,
পলে পলে মরছে যারা অনাহারের চিতায় জ্বলে ;
লিখব আজি তাদের কথা, চোখ থাকতে অন্ধ যারা,
অন্ধ যারা—বন্ধ যারা জ্যান্ত মৃত পশুর পারা ;

অজ্ঞ পিতা সন্তানেরে অজ্ঞানতার টানছে কারায়,
মূর্খ মাতা ছেলের মুখে আপন হাতে বিষ তুলে ছ্যায়।
তাদের কথা লিখব আমি লিখব আজি আগুন দিয়ে,
লিখব আজি ঝড়ের রাতের অট্টহাসি বিজলী নিয়ে।
লিখব আজি বজ্র দিয়ে ধ্বংস-পাখীর প্রলয় পাখায়,
লিখব আজি সোয়ার হয়ে জীবনদানের রক্ত ঘোড়ায়।

নগর ছাড়া সহর ছাড়া অজ্ঞানতার অন্ধকারা,
যুগের যুগের অত্যাচারে তিলে তিলে মরছে যারা।
আশা-হারা ভাষা-হারা সুদূর গাঁয়ের একটি কোণে,
রোগ, ব্যাধি আর শোষণকারী, সমান যুঝে সবার সনে ;
আজকে রণে ক্লান্ত হয়ে, নির্ব্বাসিত ভাইরা আমার,
গণছে করে বাকী আছে মরণ-ঘুমের কদিন বা আর।
যাব আমি তাদের কাছে বলব ডেকে, ভাইরা ওরে,
আকাশভরা শূণ্যতারে এনেছি আজ বক্ষে ধরে।

হাস্নু মিঞার ভাই

হাস্নু মিঞার ভাই এলো আজ,
এলো তাহার একটি ছোট ভাই ;
কি করে বা এলো সে যে, কোন পথটি পেরিয়ে এলো,
কোন পথে বা কাহার সনে দেখা হল
একা একা ভাবছি বসে তাই।
হাস্নু মিঞা এসেছিল চাঁদের ওপর চড়ে,
শিশু চাঁদের মতন বাঁকা নৌকাখানা, নীল আকাশের
নীল সায়রে জোছনা ধারার ঢেউগুলি সব
পড়্‌ছিল যে তুলট মেঘের পরে ;
হাস্নু মিঞা এসেছিল সেদিন বাঁকা ঈদের চাঁদে চড়ে।
হাস্নু মিঞার ভাই এলো আজ ঝড়ের ওপর সোয়ার হয়ে
তুফান ঘোড়ার লাগামটি সে বিজলী দিয়ে শক্ত করে
দুহাত দিয়ে ধরে,
মেঘে মেঘে কড়াৎ কড়াৎ শব্দ হয়ে বজ্র ডেকে,
বিজলী আলোর আতসবাজী জ্বালিয়ে দিয়ে
দিক-বধূরা নিল আজি বরণ তারে করে,
হাস্নু মিঞার ভাই এলো আজ ঝড়ের ঘোড়ায় চড়ে।

ঝড়ের ওপর চড়ে,

হাস্যু মিঞার ভাই এলো আজ, ভাঙছে আকাশ, ভাঙছে পাতাল,

বিষম ঝড়ের দাপট লেগে সকল ধরা উঠছে নড়ে নড়ে।

মেঘ-ফণীদের মাথার মণি—বিজলী মণি,

বিষম ঝড়ের আঘাত হানি

কে যেন আজি নিচ্ছে হরণ করে,

মেঘ-নাগেরা ক্ষিপ্ত হয়ে দলে দলে,

বজ্র বাজার বিষম রোলে ;

আজকে তারে যুঝ্‌তে যেন চল্‌ছে দাপট ভরে,

হাস্যু মিঞার ভাই এলো আজ ঝড়ের ঘোড়ায় চড়ে।

হাস্যু মিঞা এসেছিল, হাতে লয়ে মোহন বাঁশী

মুখে লয়ে চাঁদের হাসি,

আকাশ হতে তারার রাশি ঝর্‌ছিল তার

হাত-পা গুলির পরে,

হাস্যু মিঞার ভাই এলো আজ ঈশান-কোণে কামান দেগে

আকাশ হতে বজ্র হেঁকে ধ্বংস আগুন জ্বালিয়ে দিগন্তরে ;

অত্যাচারীর অত্যাচারে, সৃষ্টি যখন যাচ্ছে পুড়ে,

লক্ষ নরের কান্না যখন ফেনিয়ে ওঠে খোদার আরশ পরে ;

হাস্যু মিঞার ভাই যে তখন এলো তাহার

কামান-আগুন জ্বালিয়ে দিগন্তরে।

হাস্যু মিঞা এসেছিল—তখন ছিল ফসল ভরা মাঠ,

সরষে ক্ষেতের হলুদ খাতায় মটর শুঁটি লিখছিল তার

সিঁদুর বরণ প্রথম পড়ার পাঠ।

তখন ডালে ডালে

কালো কোকিল ফিরছিল গান গেয়ে,

মাঠটি জোড়া কুসুম ফুলের শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে বায়ে,

খোঁপায় গুঁজে ঢোল কলমী,
দিগন্তরে দাঁড়িয়েছিল দিগঙ্গনার মেয়ে,
তখন এলো হাস্থ মিঞা বাঁশীতে তার মাঠের গানটি গেয়ে।
হাস্থ মিঞার ভাই এলো আজ ঘূর্ণী হাওয়ার রথে,
অঙ্গ হতে গয়না খুলে বিধবা মাঠ ধূলায় ধবল
বসন খানি নাড়্‌ছে আকাশ পথে,
শুক্‌নো নাড়ায় আগুন জ্বালি মাটিরে আজ পুড়িয়ে দিতে
ধেই ধেই ধেই নাচছে কাপালিক ;
চৈত্র রোদের তপ্ত দাহে ফাটলেতে ফাট্‌ছে মাটি
আগুন জ্বালা জ্বল্‌ছে চারিদিক।
হাস্থ মিঞার ভাই যে তখন এলো তাহার
বজ্রে গড়া বাঁকা-লাঙল হাতে,
সূর্য্য রথের সাতটি ঘোড়া তপ্ত আগুন জ্বালায় জ্বলে
এলো তাহার সাথে।
হান্‌বে আঘাত, খুঁড়বে মাটি, চুড়বে শিকড়
ভাঙবে ঢেলা—পাথর ঢেলা, কঠিন লোহার তুড়বে নিগড় ;
শুক্‌নো মাঠে চল্‌বে ছুটে—হাউই টুটে
কঠিন মাটি ধূল ধূলাধূল,
ধূলার দোলায় তুল্‌বে যখন,
সর্ব্বনাশের অগ্নি জ্বালায় মিথ্যা যাহা, দ্বন্দ্ব যাহা, বন্ধ যাহা
মিথ্যা নীতির বন্ধ রাহা,
অতীত দুর্গন্ধ রাহা,
সর্ব্বনাশের অগ্নি-জ্বালায় ভস্মাবশেষ করবে যখন ;
হাস্থ মিঞা বাজিয়ে বাঁশী, মুখে মেখে চাঁদের হাসি ;
রঙিন ভোরের মন্ত্র পড়ি করবে নূতন ফসল বপন,
ভাইটি এসে হাস্থ মিঞার কোলটি জুড়ে বস্‌বে তখন।

কৃষাণী

ছোট ঘরখানি, উপরেতে ছায়া মেলিয়াছে বাঁশঝাড়,
পাতার মায়ায় ভুলায়ে বাতাসে ছুড়িতেছে গায়ে তার।
ওধারেতে বন, লতা-পাতা-ফুল-ফলের আখর লয়ে,
লিখিছে লিখন অবুঝ ভাষায় কোন সে কাহিনী কয়ে।
সে ভাষায় যাহা বলিতে পারেনি, পাখীর কাকলী সনে
কহিয়া বোঝাতে চেষ্টা করিছে বন হতে আর বনে।
ঘরের ওধারে জাংলার পরে ঝিঙা ও ছিমের লতা,
লতায় লতায় বুনায়ে চলিছে কার যেন কি মমতা।

ওধারের বন, জাংলার লতা, আর ঘন বাঁশ ঝাড়,
কেউ ফুল দিয়ে, কেউ ফল দিয়ে, কেউ পাতা দিয়ে তার;
মনের মতন একটি মেয়েরে গড়িয়া যতন ভরে,
জীবন দিয়েছে রঙিন ফুলের ফোটার মন্ত্র পড়ে।
গহন বনের রহস্য ভরা তাহার সোনার গায় ;
চাহিয়া দেখিতে মন যেন কোন সুদূরে চলিয়া যায়।
মমতা মাখান রাঙা মুখখানি, দূর বহু কোন দূরে,
কে যেন আপন, স্নেহ পাঠায়েছে সেই অধরেতে পুরে।
সে মুখের কথা কত কাল যেন শুনিয়া শুনিয়া হায়,
মমতায় ঢলে ঘুমায়ে ছিলুম বিস্মৃতি রাতি-ছায়।
আজকে কাহার সোনার মুখের হঠাৎ শুনিয়া কথা,
মনের গহনে কে দোলায়ে গেল সেই পরিচয় লতা।
এত ভাল আর এত সুন্দর, এমন মমতা পরী,
আমি মরে যাব, আমি মরে যাব, আরসীতে তারে ধরি।

সোনার মেয়ে

আহারে সোনার মেয়ে!
তোর ও জীবনে কি হইবে আর আমার আদর পেয়ে।
কতটুকু আমি পারিব করিতে, সাধ্য কত বা আছে,
মিথ্যা নীতি কু-সংস্কার তোর চলিতেছে পাছে পাছে।

এমন কাজল টানাটানা চোখ, মুখেতে মধুর হাসি,
তাহাতে ফুটিছে কথার কাকলী দন্ত কুসুমে ভাসি।
ও দেহ লতিকা হেলিছে দুলিছে কিশোর কালের বায়,
আদরে সোহাগে মানে অভিমানে চল চঞ্চলতায়।
ওই মন্দিরে শিশু-প্রাণটি যে শিশির বিন্দুসম,
চারিদিকে ঘন অজ্ঞানতার আন্ধার নির্ম্মম।
কতটুকু আমি পারিব করিতে, রাক্ষস সংসার,
গাঁথিছে গোপনে তোর চারি ধারে নির্ম্মম কারাগার।

অভাগিনী মেয়ে! তোর পানে চেয়ে চোখে যে মানে না জল,
ও দেহ মুকুরে হেরিলাম তোর পরিণাম অবিকল।
এত আদরের মাতা আর পিতা সব চেয়ে হবে পর,
আপনার জন তারাই রচিবে শিকল ঘেরা যে ঘর।

ওই টানা চোখ, ওই রাঙা মুখ, ওই ফুল দেহখানি,
এত যে যতনে শাড়ী গহনায় জড়াও পুলক মানি ;
তারাই তোমার সবচেয়ে অরি, আলোক প্রদীপ হানি,
পথ দেখাইয়া আনিবে তোমার মহা-শত্রুরে টানি।

বদ্ধ-তুয়ার অন্ধ হেরেম, তাহার একটি ধারে,
জীবনের মত বন্দিনী তোরে হতে হবে একেবারে।
তার পর তোর সুদীর্ঘ কাল গড়াইয়া যাবে ধীরে,
মহা আন্ধার হানিবে আঘাত জীবন প্রদীপটিরে।
তোর ও রূপালী দেহ-মুকুরেতে এ পরিণামের ছবি,
এত যে স্পষ্ট কি করে মুছিবে হতবাক এই কবি।

নির্ব্বাসিতা

সোনার বরণ রাজার কন্যা বন্দিনী আজ গরীবের কুড়ে ঘরে,
পরণে তাহার ছিন্নবসন ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাঁদিছে অঙ্গভরে।
চুলে নাই তেল, পেটে নাই ভাত, রোগ পাণ্ডুর মলিন বয়ানখানি,
সুখ বাসরের হাসি গান পরে চলিয়াছে যেন মহা অভিশাপ হানি।
স্তনে নাই দুধ, কোলের শিশুটী কঙ্কালসার, শুক্‌নো কাঠেরে হায়,
সাজাইয়া তার বুকের শ্মশানে আগুন জ্বালার রয়েছে প্রতীক্ষায়।

হাতে ছিল চাঁদ, পায়ে ছিল চাঁদ, মুখেতে পদ্ম ফুটিত খুসীর ভরে,
সেখানে এখন অভাব-দস্যু স্বেচ্ছায় ফেরে সব লুণ্ঠন করে।
যে মুখপদ্ম গন্ধের লোভে রাজপুত্রেরা ফিরিত পাথার বন,
সেই মুখ আজ মলিন হয়েছে করিতে করিতে অভাবের ক্রন্দন।
সোনার খাটেতে শয়ন করিয়া পান সে করিত রূপোর গেলাসে জল,
সেই জলে আজি নানান্ রোগের বীজাণু আসিয়া করিতেছে কলবল।

রাজ্য হারায়ে রাজা আজি তার লাঙল লইয়া মাঠের নির্বাসনে,
খুঁড়িতেছে মাটি, বুনিছে ফসল চৈত্র দিনের দারুণ রোদের রণে।
মাঠ ভরা তার সোনার ফসল দস্যু আসিয়া নিয়ে যায় মুঠি ভরে,
ক্ষুধার অন্ন পরকে সপিয়া সারাটী জনম কাঁদে ক্ষুধা ক্ষুধা করে।

আনোয়ারা

আনোয়ারা নামে চাষীর মেয়েটি, দেখা হল তার সনে,
হাসির রেখাটি ঈষৎ প্রকাশি মিলিছে অধর কোণে।
ছুটি রাঙা ঠোঁটে জড়ায়ে পড়িয়া যত মিঠে কথা হায়,
দন্তকুসুমে ভোমর হইয়া উড়িছে হাসির বায়।

হলুদের মত ডুগু ডুগু রঙ ঝরিছে অঙ্গ ভরি,
সরিষার খেত হইতে কে চাষী কুড়ায়ে এনেছে পরী।
ছেঁড়া শাড়ীখানি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আধেক উঠেছে শিরে,
যেন জীবন্ত কাঁদিছে অভাব আজকে তাহারে ঘিরে।
গরীবের ঘরে কি করে সে এলো? তার বাপ বুঝি হায়,
কুসুম-ফুলের খেত করেছিল ওই দূর মেঠো গাঁয়।
পরীদের মেয়ে বেড়াতে বেড়াতে হয়ত আকাশ হতে,
রঙিন ফুলের রঙেতে ভুলিয়া নেমে এলো এই পথে।
অঙ্গ ভরিয়া কুসুম ফুলের মাখিতে পরাগগুলি,
জানিতে পারেনি কখন গিয়াছে পূর্ব্ব জনম ভুলি।
কুসুম ফুলের খেত নিড়াইতে গুচ্ছ ফুলের সনে,
পিতা বুঝি তার সঙ্গে করিয়া এনেছিল এই কনে।
গরীবের ঘরে আনিয়াই তারে পরাইল হীন বেশ,
কি দিবে খাইতে অভাবের ঘরে দুঃখের নাহি শেষ।

ঠির ঠির করে কাঁপিতে কাঁপিতে দারুণ শীতের প্রাতে,
ক্ষুধার অন্ন জোগাইতে ফেরে ভিক্ষা পাত্র হাতে।

এই হীন বেশ, এত যে অভাব তবু হাসি মুখপানে,
চেয়ে মনে হয় পথ ভুলে ও যে আসিয়াছে এইখানে।
আরেক দেশের মানুষ ও যেন, একখানা লাল শাড়ী,
কে আনিতে পার পরাইয়া দিতে সোনার অঙ্গে তারি।
পাখীর আহার তুইটি অন্ন যে পার তাহারে দিতে,
আকাশের পরী দেখিতে পাইবে মাটির এ ধরণীতে।
তাজমহলের কীর্ত্তি গড়িতে কারো যদি সাধ থাকে,
এইখানে এসে খনেক দাঁড়াও এই গেঁয়ো পথ বাঁকে।
পাষাণে তোমরা গড়িয়াছ তাজ, নহে তাহা অক্ষয়,
কাল-নটেশের চরণের ঘায়ে কোনোদিন পাবে লয়।
এ মানুষ-তাজ কে গড়িবে ভাই, একটু জ্ঞানের আলো,
একটু বুকের আদর ভরিয়া এর বুকে তুমি ঢালো।
এ কুসুম ফুল শতদল মেলি এমনি পাইবে শোভা
স্বরগে মরতে যত রূপ আছে সবচেয়ে মনোলোভা।
এ ম্লান মুখের এ হাসি সেদিন নবীন উষার পারা,
মেঘে আর মেঘে লোক হতে লোকে ছড়াবে আলোর ধারা
ও রাঙা অধর হইতে সেদিন কথার কুসুম ফুটে,
টুটিয়া লুটিয়া ছড়ায়ে পড়িবে দেশ হতে দেশে ছুটে।

জলের কন্যা

জলের উপরে চলেছে জলের মেয়ে,
ভাঙিয়া টুটিয়া আছড়িয়া পড়ে ঢেউগুলি তটে যেয়ে।
জলের রঙের শাড়ীতে তাহার জড়ায়ে জড়ায়ে ঘুরি,
মাতাল বাতাস অঙ্গের ঘ্রাণ ফিরিছে করিয়া চুরি।
কাজলে মেখেছে নতুন চরের সবুজ ধানের কায়া,
নয়নে ভরেছে ফটিকজলের গহন গভীর মায়া।
তাহার উপর ছায়া-চুরি খেলা করিতে তটের বন,
সুবাস ফুলের গন্ধ ছড়ায়ে হাসিতেছে সারাক্ষণ।

জলের কন্যা চলেছে জলের রথে,
খুশিতে ফুটিয়া শাপলা পদ্ম হাসিতেছে পথে পথে।
আগে আগে চলে কলজলধারা ভাসায়ে পানার তরী,
চরণে তাহার আলতা পরাতে হিজল পড়িছে ঝরি।
ডাহুক ডাহুকী ডাকে বন-পথে নতুন পানির সুরে,
কোড়া আজ তার কুড়ীরে খুঁজিছে ঘন পাট-খেতে দূরে;
পুরাতন জালে তালি দিতে দিতে ঢলিয়া জেলের গায়,
জেলে বো'র মন মিহিস্থুরী গানে উজানীর বাঁকে ধায়।
পল্লী বধূরা উদাস নয়নে চেয়ে থাকে তটপানে,
বাপের বাড়ীর মমতায় আজ পরাণ কেন যে টানে;

বাঙড়ের খালে সিনান করিতে কলসী ধরিয়া টানি,
মায়েরে কহিছে মেয়ের কথাটি নয়া-জোয়ারের পানি।
হোগলার ছই নতুন বাঁধিয়া গাব-জলে মাজা নায়,
বাপ চলিয়াছে মেয়েরে আনিতে সুদূরের ভিন গাঁয়।
বৈঠার ঘায়ে গলাজলে-ডোবা নাচিছে আমন ধান,
কলমির লতা জড়াইয়া তারে ফুলহাসি করে দান।
ঢ্যাপের মোওয়ায় চিত্রিত হাঁড়ি আবার ভরিয়া যায়,
পিঠায় আঁকিয়া নতুন নক্‌শা রাত ভোর করে মায়।

জলের কন্যা চলেছে জলের পরে,
মাছেরা চলেছে দলে দলে আজ পথটি তাহার ধরে।
রুহিত লাফায়, চিতল ফালায়, ভাটা মাছ সারি সারি,
সাথে সাথে যায় আগে পিছে ধায় খুশি যেন ওরা তারি।
শোল মাছ তার শিশুপোনাগুলি ছড়ায়ে লেজের ঘায়,
টুবটুব করে আদরিয়া পুনঃ জড়াইছে বুক ছায় ;
নকশী কাঁথাটি মেলিয়া ধরিয়া গুমরে চাষার নারী,
সযতনে যেন গুটায়ে ধরিছে বুকের নিকটে তারি।
জলঘাসগুলি ঈষৎ কাঁপিছে তাদের চলার দোলে,
মৃদুল বাতাসে ঝুমিতেছে বন জলের দুনিয়া কোলে।

জলের কন্যা যায়,
নতুন পানির লিখন বহিয়া বদ্ধ বিলের ছায়।
তটের বক্ষে আছাড়িয়া মাথা ক্ষত বিক্ষত করি,
বন্দী-মাছেরা কাটাইত দিন জীয়ন্তে যেন মরি।
অঙ্গ ভরিয়া শ্যাওলা-জড়ান নির্জ্জীব-ঘুম-দোলে,
রোগ-পাণ্ডুর অসাড় দেহ যে পড়িতে চাহিছে ঢলে।

আজিকে নতুন জল-কল্লোল শুনিতে পেয়েছে তারা,
সহসা অঙ্গে হিল্লোলি ওঠে উধাও গতির ধারা।
কে যেন ঘোষিছে তাহাদের কানে সহস্র দিক হতে,
ভাঙ্ ভাঙ্ কারা ভাঙ্ ভাঙ্ পার উদ্দাম জলস্রোতে।

জলের কন্যা জল-পথ দিয়ে যায়,
বকের ছানারা পাখার আড়াল রচিছে তাহার গায়।
দুইধারে ঘন কেয়ার কুঞ্জ ছড়ায় সুবাস-রেণু,
মাতাল বাতাস রহিয়া রহিয়া চুমিছে বনের বেণু।
তটে তটে কাঁদে শূন্য কলসী, কুটিরের দীপ ডাকে,
আঙিনার বেলী মাটিতে লুটায়, কে কুড়ায়ে লবে তাকে?

বস্তীর মেয়ে

বস্তীর বোন, তোমারে আজিকে ছেড়ে চলে যেতে হবে,
যত দূরে যাব তোমাদের কথা চিরদিন মনে রবে।
মনে রবে সেই ভাপসা গন্ধ অন্ধ-গলির মাঝে,
আমার সে ছোট বোনটির দিন কাটিছে মলিন সাজে।
পেট ভরা সে যে পায়না আহার, পরণে ছিন্নবাস,
দারুণ দৈন্য অভাবের মাঝে কাটে তার বারোমাস।
আরো মনে রবে, সুযোগ পাইলে তার সে ফুলের প্রাণ,
ফুটিয়া উঠিত নানা রঙ লয়ে আলো করি ধরাখান।
পড়িবার তার কত আগ্রহ, একটু আদর দিয়ে,
কেউ যদি তারে ভর্ত্তি করিত কোন ইস্কুলে নিয়ে ;
কত বই সে যে পড়িয়া ফেলিত, জানিত সে কত কিছু,
পথ দিয়ে যেতে জ্ঞানের আলোক ছড়াইত পিছু পিছু।
নিজে সে পড়িয়া পরেরে পড়াত, তাহার আদর পেয়ে,
লেখাপড়া জেনে হাসিত খেলিত ধরণীর ছেলেমেয়ে।

হায়রে দুরাশা, কেউ তারে কোন দেবে না সুযোগ করি,
অজ্ঞানতার অন্ধকারায় রবে সে জীবন ভরি।
তারপর কোন মূর্খ স্বামীর ঘরের ঘরণী হয়ে,
দিনগুলি তার কাটিবে অসহ দৈন্যের বোঝা বয়ে।

এ পরিণামের হয় না বদল ?   এই অন্যায় হতে
বস্তীর বোন তোমারে বাঁচাতে পারিব না কোন মতে ?
ফুলের মতন হাসি খুসী মুখে চাঁদ ঝিকি মিকি করে,
নিজেরে গলায়ে আদর করিয়া দিতে সাধ দেহ ভরে।
তুমি ত কারুর কর নাই দোষ, তবে কেন হায় হায়,
এই ভয়াবহ পরিণাম তব নামিছে জীবনটায়।

এ যে অন্যায় এ যে অবিচার, কে রুখে দাঁড়াবে আজ,
কার হুঙ্কারে আকাশ হইতে নামিয়া আসিবে বাজ।
কে পোড়াবে এই অসাম্য-ভরা মিথ্যা সমাজ বাঁধ,
তার তরে আজ লিখিয়া গেলাম আমার আর্ত্তনাদ।
আকাশে বাতাসে ফিরিবে এ ধ্বনি, দেশ হতে আর দেশে,
হৃদয় হইতে হৃদয়ে পশিয়া আঘাত হানিবে এসে।
অশনী পাখীর পাখায় চড়িয়া আছাড়ি মেঘের গায়,
টুটিয়া পড়িবে অগ্নি-জ্বালায় অসাম্য ধরাটায়।
কেউটে সাপের ফণায় বসিয়া হানিবে বিষের শ্বাস,
দগ্ধ করিবে যারা দশ হাতে কাড়িছে পরের গ্রাস।
আলো বাতাসের দেশ হতে কাড়ি, নোংরা বস্তী মাঝে,
যারা ইহাদের করেছে ভিখারী অভাবের হীন সাজে।
তাহাদের তরে জ্বালায়ে গেলাম শ্মশানে চিতার কাঠ,
গোরস্থানেতে খুঁড়িয়া গেলাম কবরের মহা-পাঠ।
কাল হতে কালে যুগ হতে যুগে, ভীষণ ভীষণতর,
যতদিন যাবে তত জ্বালা-ভরা হবে এ কণ্ঠস্বর।
অনাহারী মার বুভুক্ষা-জ্বালা দেবে এরে ইন্ধন,
দিনে দিনে এরে বিষায়ে তুলিবে পীড়িতের ক্রন্দন।
দুর্ভিক্ষের স্তন পিয়ে পিয়ে লেলিহা জিহ্বা মেলি,
আকাশ বাতাস ধরণী ঘুরিয়া করিবে রক্ত কেলি।

পাকিস্তান

মোদের পাকিস্তান,
লহু দিয়ে গড়া, জান দিয়ে গড়া, প্রাণ দিয়ে গড়া মান।
এইখানে এসে বুক্ টান্ করে আমরা দাঁড়াতে পারি,
উচ্চে ফুকারি হাঁক দেই যবে, আধেক তুনিয়া নাড়ি ;
ইরাণ, তুরাণ, মিশর আজম প্রসারিত হয়ে বুক,
তবু ভরে নারে অতৃপ্ত স্নেহ, বিন্দু যে ধরাটুক।
কোটি ধরণীরে প্রসারিয়া আছে অনন্ত মহীয়ান,
তাইতো তাহারে ফুকারিয়া ফেরে এ বুকের ফোরকান।

মোদের পাকিস্তান,
লহু দিয়ে গড়া, জান দিয়ে গড়া, প্রাণ দিয়ে গড়া মান।
তুনিয়ার বুকে রোপিয়াছি মোরা এই নব ছায়া-তরু,
এই খানে এসে জুড়াইবে প্রাণ যত পথচারী মরু।
যত ব্যথাতুর, যত নিপীড়িত যত বঞ্চিত জন,
এই খানে এসে জুড়াবে তাদের বুকভরা ক্রন্দন।
রাঙা ফজরের মেহেদীর রঙে হাসিছে আতসবাজ,
মানুষেরে দিয়ে গড়িবে ধরায় আবার সে নবতাজ।
আবার আসিবে ওমরফারুক আর আবুবক্কর,
খলিফায়ে রাশেদিনের তখত নামিবে ধরার পর।

ছেঁড়া মাদুরের অর্দ্ধেকে যারা জাহান করিত ক্রয়,
ভাঙা তাম্বুর ছায়ায় রচিত জগতের আশ্রয়।
অর্দ্ধেক রুটি পাগড়িতে বাঁধি ঘুরিত ধরণীভরে ;
সাত সাগরের তুফান দুলিত যাদের পোতের ভরে।
ক্ষুধায় পেটেতে পাথর বাঁধিয়া যুঝিত ভায়ের তরে,
এক হাতে নাঙা তলওয়ার আর ফোরকান আর করে।
তাহারা আজিকে এসেছে মোদের রক্ত ধারায় নেয়ে,
সহসা আমরা কি হয়েছি যেন 'ধরণীর বুকে' কিবা সম্পদ পেয়ে

আবার আমরা গড়িব কুতব ইট কাঠ দিয়ে নয়,
জীবন দানের কীর্ত্তি যে হেথা অনন্ত অক্ষয়।
গড়িব হাফেজ রুমি খৈয়াম গালিব ও আলোয়াল,
যাদের কীর্ত্তি পাহরায় রবে অনন্ত মহাকাল।
মানুষের গড়া ইট কাঠ দিয়ে মানুষেরে আবরিয়া,
যারা গড়েছিল গোরস্থান যে ভরি ধরণীর হিয়া ;
সে সব আজিকে ভাঙিয়া গড়িব মানুষের জিন্‌নাত,
জাগিবে মানুষ দিকে দিগন্তে গাহি জীবনের নাত।

আমাদের এই পাকিস্তানের যারা হবে কাণ্ডারী,
বৃশ্চিক জ্বালা ভরা যেন হয় তাহাদের বিভাবরী।
বিশ্রাম যেন নিষিদ্ধ হয়, কণ্টক পথ গায়,
যেন তারা চলে শত বাঁধা দলি ক্ষত বিক্ষত পায়।
সুখ যেন তারা পায়না জীবনে, পীড়িতের হাহুতাশ,
তিলে তিলে যেন বিষাইয়া তোলে তাহাদের বারমাস।
অন্নহীনেরে অন্ন না দিয়ে যেন তাহাদের মুখে,
বিলাস আহার শত সর্পের দংশনে জ্বলে ধুকে।

ঘরহারা যদি কাঁদে পথে পথে যেন তাহাদের ঘর,
আসমান হতে বজ্র পড়িয়া জ্বলে তা নিরন্তর।
জাতির অর্থ অপচয় যদি করে কেউ নিজ কাজে,
ওমরের মত পাগড়ী ধরিয়া জনগণ যেন যাচে ;
কেন করিয়াছ জাতির অর্থ আপনার তরে ক্ষয়,
আমাদের জাতি হয় যেন আজ সেইরূপ নির্ভয়।

মোদের কবির কণ্ঠে যেন গো জনগণ রূপ পায়,
তাহাদের তরবারি যেন সেথা খরধারে চমকায়।
অশনি বাজের ত্রাস হয়ে তাহা সপ্ত আকাশে ঠুকে,
শত শোষিতের ব্যথা বিষায়িত অত্যাচারীর বুকে,
যেন ভেঙে পড়ে যুগের যুগের নাশি নির্ম্মম মার,
পাকিস্তানের ছায়াতরু-তলে সকলে সকলকার।

নাজীর

নাজীরের দেহ কবরের তলে রাখিয়া এলাম ঢেকে,
কত কথা মনে ঢেউ দিয়ে যায় স্মৃতির কুহেলী থেকে।
কোথায় ছেলেটী অসুখে ভুগিছে, গভীর রাতের কালে
নাজীর তাহার শিয়রে বসিয়া জলপটি দেয় ভালে।
কাহাদের বাড়ী তিনদিন ভরি চলিতেছে অনাহার,
চালের বস্তা মাথায় লইয়া নাজীর তাদের দ্বার।
দাঙ্গার দিনে সুদূর হিন্দু-পল্লীর কোন্ কোণে,
তিন চার ঘর মুসলমানেরা ভয়ে ভয়ে দিন গোণে ;
সৌম্যমূরতি নাজীর সেথায় নির্ভয়ে চলে যায়,
নয়নের জল মুছাইয়া বলে, ভাই ওরে বুকে আয় !

কোন ছাত্রের আহার বন্ধ হলের 'ডিউ' না দিয়ে,
নাজীর তাহার নিজের খাবার খাইছে তাহারে নিয়ে।
কাহার 'ফিসে'র টাকা আসে নাই, সকলের দ্বারে এসে
সিকি ও আধুলি করিছে ভিক্ষা নাজীর দীনের বেশে।
'নাইট-ইস্কুলে' কুলীমজুরের ময়লা ছেলের দল,
প্রথমপড়ার বইগুলি লয়ে করিতেছে কোলাহল।
মধ্যে তাদের চেরাগ জ্বালিয়া নাজীর বসিয়া আছে,
নয়নে তাহার না-আসা কালের কাজল কে আঁকিয়াছে।
বিকারের রোগী জ্ঞান হয়ে কহে, আমার শিয়র দেশে,
কোন ফেরেস্তা বাতাস করিছে বেহেস্ত হতে এসে।

নাজীর হাসিয়া উত্তর করে, ভাই ওরে, শুধু ভাই,
আকাশের মত ভালবাসা সেত বুকে যে ধরে না তাই।
সে নাজীর আজি ফুরাইয়া গেল, গহন মাটির গোর,
আর কোনদিন তার তরে হায় খুলিয়া দিবে না দোর।

নাজীর! নাজীর! তুমি কাছে নাই হয় না যে প্রত্যয়,
এত ভাল তুমি বাসিতে যাদের ছেড়েত যেতে না হয়।
পরেরে পরাণ দিবার লাগিয়া ফুকারিতে দ্বারে দ্বারে,
বিনা-মূলে তোরা কে নিবিরে আয়, বিকাইব আপনারে।
সে পর আজিকে নিয়েছে তোমারে, নিয়েছে ছুরির ঘায়
তারপরে আজ হয়ত তোমার কোন ক্ষোভ নাহি হায়।
আমাদেরো আজ কোন ক্ষোভ নাই, শুধু শুধাইব তারে
এ দান পাইয়া কোথায় রাখিলি বারেক দেখায়ে যারে।
বুকেতে জড়ায়ে রাখিতে পারিলে, সে বুকের আসমানে
রবি শশী তারা গড়াগড়ি যেত সোনালী আলোর বাণে।
নয়নে রাখিলে সে নয়ন দিয়ে জ্বলিত যে দীপ-জ্বালা
লক্ষযুগের অন্ধকারের টুটিত কুহেলী কালা।
অধরে রাখিলে সে অধর হতে বাহিরিত হেন গান,
লক্ষযোজন পার হয়ে এসে প্রাণ খুঁজে পেত প্রাণ।
সমাজ নীতির রহিত না বাঁধা রহিত না মন্তর,
হৃদয় হইতে হৃদয়ে হইত প্রসারিত অন্তর।
এত বড় প্রাণ হায়রে অভাগা! রাখিলি ছুরির ধারে,
বড় ক্ষোভ তুই, বুঝিবি না কত বঞ্চিলি আপনারে।
তবু বলি ওরে একবার শুধু শোনরে একটিবার,
আর শোন যারা এম্নি করিয়া পরেরে দেছিস মার।

পরবাসী তার ছেলেরে স্মরিয়া একটি গৃহের তলে,
জাগিছে জননী, সাথে সাথে তার মাটির প্রদীপ জ্বলে।
ভোরের আজান হইতে না হতে তসবী লইয়া করে,
খোদার আরসে পড়ে মোনাজাত ছেলেরে তাহার স্মরে ;
রেহেলের পর কোরাণ রাখিয়া পড়ে সুরা ফাতেহায়,
গ্রন্থের পাতা নয়ন পাতার পানি পড়ে ভিজে যায়।
দশটা বাজিলে পিয়ন আসিবে, পথ পানে চেয়ে থাকে,
পরবাসী তার ছেলেরে যে মাতা সারাপথ দিয়ে আঁকে।

* * * *

আজি কারবালা হইতে কাসেদ ফিরিবে লেখন নিয়া,
দুলাল তাহার ফিরিবে না আর ডাকিবে না মা বলিয়া।
এ দুখেরে মাতা কি করে সহিবে ! খোদা তুমি রহমান,
তুমি যাহা কর সবই যে তোমার রহমত কর দান।

শোন শোন যারা এম্‌নি করিয়া মেরেছ পরের ছেলে,
ঘরে ঘরে যারা এমনি করিয়া দিয়েছ কবর মেলে ;
শোন শোন যারা মানুষের গড়া সমাজ নীতির ভোলে,
মানুষের বুকে হেনেছ আঘাত যুগে যুগে মার কোলে।
নাজীরের বাপ কালকে আসিবে ছেলেরে দেখিতে তার,
একটি বাপের ওই একই ছেলে জান কত মমতার ?
দেখিতে আসিবে ছেলেরে তাহার কতদিন চিঠি নাই,
ভাল সে বাসিত যেসব খাবার মা দেছে সঙ্গে তাই।
মোসলেম-হলে দাঁড়ায়ে কহিবে আমার নাজীর কোথা,
কেয়ামত-তক দুলিয়া উঠিবে কবরে কবরে ব্যথা।
তোমার মিথ্যা সমাজ ভেদের নীতির থাকিলে জোর,
সে সময়ে তুমি দাঁড়াইও আসি নয়নে না লয়ে লোর।

নাজীরের বাপ ফিরিয়া যাইবে আবার আপন ঘরে,
নাজীরের সেই শূন্য বিছানা বাক্স সঙ্গে করে।
অর্দ্ধেক পড়া বইগুলি তার লেখা ও অলেখা খাতা,
পাতায় পাতায় স্মৃতিগুলি তার আখরের মত পাতা।
এসব লইয়া ফিরিয়া যাইবে সুদূর পল্লী গাঁয়,
পাগলিনী বেশে ছুটিয়া আসিবে তার অনাথিনী মায়।
সে সময় তুমি দুইটি নয়ন না ভরি নয়ন জলে
কহিও তাহার যাদুরে মেরেছ কোন সে নীতির বলে।
যদি নাহি পার, সে মার চোখের অশ্রুমতির জলে,
সিনান করিয়া শপথ করিও, এই কথাগুলি বলে ;
মায়ের ছেলেরা ! শোন শোন আজ, তোমাদের তরে আর ;
মিথ্যা সমাজ ধর্ম্ম ভেদের রবে না অত্যাচার।
যে প্রাণধর্ম্ম মমতা করুণা মানুষের বুকে বুকে,
বিধাতার দেওয়া সে-ধর্ম্ম হোক প্রসারিত লোকে লোকে।
তাহারি ছায়ায় মানুষে মানুষে হোক নবপরিচয়,
মায়ের ছেলেরা ধরণীর বুকে চিরতরে নির্ভয়।

কি প্রলাপ আজ কহিতেছে কবি, হজরত ঈশা মুসা,
জীবনদানেও আনিতে পারেনি যে মহা-মিলন উষা ;
সে মিলন আজ নামিয়া আসিবে একটি ক্ষুদ্রদানে,
নাজীর ! নাজীর ! ঘুম যাও তুমি বড় ব্যথা তব প্রাণে।
অসহায় মোরা তোমারে জাগাতে পারিব না ডাক দিয়ে,
কবরের দ্বার ভাঙ্গিবে না ওরে যদিও ভাঙ্গিবে হিয়ে।
অভিমানী ভাই ! ঘুমাও ঘুমাও বড় যে ক্লান্ত তুমি,
শীতল বাতাস বহুক তোমার কবরের মাটি চুমি।

কাফেলা আজিকে ফিরিয়া যাইবে শূন্য মদিনা রাহে,
শূণ্যপৃষ্ঠ কাঁদে ঢুল ঢুল আকাশের পানে চাহে।
তোমার ও লহু অঙ্গে মাখিয়া লালে লাল আসমান,
মুরছে ধরণী রাতের কাফনে জড়াইয়া দেহখান।
জয়তুন কাঠে গড়া সে তসবী ছিঁড়েছে নবীর করে,
ফাতিমার চোখে সুরমার রেখা ধুয়েছে রোদন করে,
খোরমার বনে কাঁদে মরিয়াম বেটার শোকের জ্বালা
সহসা কে আজ জ্বালাইয়া গেল শত বৃশ্চিক ঢালা।

*   *   *   *

বরষে বরষে আসিবে ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে,
কত নব সুখ—নব নব আশা—নব নব ব্যথা লয়ে।
জ্ঞানের পথের নব-দরবেশ যাবে এই পথ দিয়া,
তৃষার্ত্ত চোখে দাঁড়ায়ে থাকিব পথখানি আগুলিয়া।
যদি কোনদিন কাহারো ত্যাগের অগ্নিশিখার পরে,
কাহারো স্নেহের বুকখানি মেলে আকাশের মত করে ;
নাজীর ! নাজীর ! সেদিনের লাগি রহিব প্রতীক্ষায়,
জ্বালায়ে রাখিব মোমের প্রদীপ গোরস্থানের ছায়।
মানুষ পুতুল ধরিয়া ধরিয়া আঁকিব সারাটি গায়,
তব জীবনের সকল কাহিনী মায়া আর মমতায় ;
যদি কোনদিন গড়িতে গড়িতে পুতুল জীবন পায়,
তোমারি মতন এত স্নেহ লয়ে এত ভাল হয়ে চায় ;
সেইদিন তুমি জাগিয়া উঠিও রাঙা ফজরের প্রাতে,
এখন ঘুমাও ঘুমাও বন্ধু ! কবরের নিরালাতে।

হাসপাতাল

১

আমরা হেথায় ভালো আছি ভাই, হাসপাতালের ঘরে,
এপাশে ওপাশে রোগী অ-রোগীতে মহা কলরব কোরে !
এক, তুই, তিন, নানা নম্বরে হই মোরা পরিচিত,
জাতি ও ধর্ম্ম-ভাষা-ঘেঁষা যত নামগুলি তিরোহিত !
একাশীতে ছিল বিপ্লবী দাদা, বিরাশীতে ছিল কাজী,
ডেপুটি হইবে তবু তার সাথে প্রেম তারে গেল বাজি,
যন্ত্রণা থাক, আর নাই থাক,—দাদারে গেলাম ডাকে
যখন তখন তাল দিত সে যে দাদার প্রাণের ঢাকে।
দাদারে দেখিতে আসিত দিদিরা, শাড়ীর করিয়া স্তব,
অতি সহজেই করিয়া লইত স্থান সেথা অভিনব।

ভালো হোয়ে সেই দাদাটি যেদিন চলিয়া গেলেন ঘরে,
বিছানা বালিশ অনাথ না কোরে মোদেরি অনাথ কোরে।
রঙিন শাড়ীর লহর দোলায়ে দিদিরা আসে না আর,—
একাশীর বেডে রোগীকে যে দেখে মোটা তিন কাকা তার
সেই খেদে হায় কাজী পলাইল আশী নম্বর জুড়ি,
আসিল দত্ত অপ্রশস্ত যেন কাগজের ঘুড়ী।
সকালে আসিয়া ডাক্তার বোন্ সাহস জোগায় তারে,
বিকালে দেখেন সকল সাহস ফুরায়েছে একেবারে।
নিতি সাহসের ভরা-ডুবি কোরে সপ্তাহ গেছে চলে,
এক্‌লাটি বোন্—তলী চেরা নাও যত সেঁচে ভরে জলে।
আজকে বিকালে দত্ত জায়ার আল্‌তা ছোপানো পা'র,
সঙ্গেতে পরিচয় হোয়ে গেছে মোদের সোপানটার !
রঙিন ঠোঁটের বাঁধন খুলিয়া কি কথা কোয়েছে কানে,
দত্ত আজিকে মহা বীরবর ঘরে-পরে সবখানে !

‘ডোণ্ট কেয়ার’ করিবেন তিনি যদি কেহ কাটে গোঁপ,
কিংবা তাহার স-জাত শ্মশ্রু করেন কেহই লোপ !
‘অপারেশনের’ সমর-ক্ষেত্রে এই বীরবরে লয়ে,
বড় কুতূহলে যেতেছে দিবস মোদের হাসিয়া বয়ে।

সকাল বেলায় ডাক্তার ঘোষ আসেন হাস্য-ভরে,
রোগীদের মাঝে বাঁধে কোন্দল তারে কাড়াকাড়ি করে।
আমেদ সাহেব বন্ধু মানুষ, বড়ই মিষ্ট-বাক্,
ডাক্তার দাস সদাই ব্যস্ত কাজ থাক নাই থাক !
দশটা বাজিতে বড় ডাক্তার ঘুরে যান প্রসেশনে,
সুন্দরী নার্স, ছাত্র ছাত্রী মিলি পঞ্চাশ জনে !
সে কালের কোন রাজা-মহারাজা রাজ্য করিতে জয়,
মহা সমারোহে চলেছে প্রতাপ ছড়ায়ে ভুবনময় !
দিবসের নার্স ফুর্‌ফুর কোরে হেথায় সেথায় ঘুরে,
হাসি-খুসি মুখে কথা কয় নাক গান গায় যেন সুরে।
নিত্য-নূতন জীবন আসিয়া লয় হেথা আশ্রয়,
কাহারো প্রদীপ নিবু নিবু কারো জ্বলিতে পাইছে লয় !
মৃত্যু মোদের সঙ্গের সাথী তবু হাসি দিয়ে তারে
ভুলায়ে রাখিতে প্রাণ পণ করি হেরে যাই বারে বারে।

সাম্‌নের বেডে বৃদ্ধ সাহেব লোল চর্ম্মতে তার,
লেখা রহিয়াছে আশী বছরের রেখা যত ঘটনার !
ব্যথায় সদাই ছট্‌ ফট্‌ করে,—কভু মুমূর্ষু প্রায়,
অতীত দিনের কাহিনীগুলিকে মনে মনে আওড়ায় !
দূর জাহাজের নাবিক সে ছিল, অর্ণবপোতখানি,—
নখ-ইংগিতে নিয়ে যেত সে যে দেশ হোতে দেশে টানি ;
কতো দারুচিনি-ছায়া-ঘেরা দ্বীপ, প্রবাল মাণিক জ্বালি,
ডাকিত তাহারে দূর দিগন্তে উড়ায়ে ধূসর বালি ;

কতো লবঙ্গ এলাচ পাতার সুগন্ধি বায়ু-ভরে,
দিগাঙ্গনার সোনার লেখন উড়েছে তাহার তরে।
সুমেরু পথের কুহেলি-বালিকা সন্ধ্যা-কমল-দলে,
আসন রচিয়া চরণ দুখানি ডুবায়েছে রাঙা জলে!
কতো ঝড়ো রাতে পবন পাগল ফেনিল উর্ম্মি-রথে,
ছুটায়েছে তার অর্ণবপোত চির-দুর্গম পথে।

আজকে তাহার জীবন-জাহাজ ভেঙেছে রোগের ঘায়,
ছিঁড়িয়াছে পাল, ভাঙিয়াছে হাল্ নাম-হীন দরিয়ায়!
রোগের আবেশে চীৎকারি ডাকে, কোথায় সাথীরা মোর,
কোথায় 'সোকানি', কোথায় সারেং—সাগরে উঠেছে জোর।
কাঁটা কম্পাস্ দাও মোর হাতে ; সুদূর দিগন্তরে,—
—আছে—আছে দীপ, দুলিছে বাতাস এলাচের ঘ্রাণ ভরে।
ঢেউ উঠিয়াছে, ছিঁড়িয়াছে পাল, নাহি ভয়, নাহি ভয়!
এখনো বক্ষে উষ্ণ রক্ত ঘোষিছে নবীন জয়!
'ক্যাবিন্-বয়েরে' ডাক দাও আজি, শিরাজী সাকীরে ডাক,
দাও মোরে সুরা তীব্র কঠোর নেশা যার থামে নাক।
আন—আন—মদ, লক্ষ বছর গহন মাটির তলে,
বদ্ধ হইয়া জমায়েছে তেজ শত বুদ্বুদ্-দলে!
দাও দাও তার ঢাকনী খুলিয়া জ্বলুক নেশার ঝাঁজ!
অভিনব খেলা খেলিব আমরা মরণেরে লয়ে আজ!
হায় রে দুরাশা! বাত্যা ব্যাহত শত তরঙ্গ সনে,
চির জয় যার হয়নিক ম্লান লক্ষ সাগর-রণে,
জীবন-রণে সে বড় অসহায়, মরণ তাহারে হায় ;
বড় অনায়াসে নিয়ে গেল তারে চির বিস্মৃতি-ছায়!
কেউ কাঁদিল না, কেউ বসিল না তাহার শিয়র দেশে,
কেউ জ্বালিল না মাটির প্রদীপ কবরের কাছে এসে!

রাতের পরী

২

রাতের বেলায় আসে যে রাতের পরী,
রজনীগন্ধা ফুলের গন্ধে সকল বাতাস ভরি।
চরণের ঘায়ে রাতের প্রদীপ নিবিয়া নিবিয়া যায়,
হাসপাতালের ঘর ভরিয়াছে চাঁদিমার জোছনায়।

মানসসরের তীর হতে যেন ধবল বলাকা আসে,
ধবল পাখায় ঘুম ভরে আনে ধবল ফুলের বাসে।
নয়ন ভরিয়া আনে সে মদিরা, সুদূর সাগর পারে,
ধবল দ্বীপের বালু-বেলাতটে শঙ্খ ছড়ায় ভারে।
তাহাদেরি সাথে লক্ষ বছর ঘুমাইয়া নিরালায়,
ধবল বালুর স্বপন আনিয়া মাখিয়াছে সারা গায়।
আজ ঘুম ভেঙে আসিয়াছে হেথা, দেহ-লাবণীর পরে,
কতনা কামনা ডুবিছে ভাসিছে আপন খুসীর ভরে।
বসনে তাহার একে একে আসি আকাশের তারাগুলি,
জ্বলিছে নিবিছে আপনার মনে রাতের বাতাসে তুলি।

রাতের বেলায় আসে যে রাতের পরী
চরণে বাজিছে ঝিঁঝির নূপুর, দোলে ধরা মরি মরি!

তাহারি দোলায় বন পথে পথে ফুটিছে জোনাকী ফুল,
রাত-জাগা পাখী রহিয়া ছড়ায় গানের ভুল।
তারি তালে তালে স্বপনের পরী ঘুমের দুয়ার খুলে,
রামধনু-রাঙা সোনার দেশেতে ডেকে যায় হাত তুলে।
হলুদ মেঘের দোলায় দুলিয়া হলদে রাজার মেয়ে,
তার পাছে পাছে হলুদ ছড়ায়ে চলে যায় গান গেয়ে।

রাতের বেলায় ঝুমিছে রাতের পরী,
মোহ মদিরার জড়াইছে ঘুম সোনার অঙ্গ ভরি।
চেয়ারের গায়ে এলাইল দেহ খানিক শ্রান্তি ভরে,
কেশের ছায়ায় মায়া ঘনায়েছে অধর লাবণী পরে।
যেন লুবানের ধুঁয়ার আড়ালে মোমের বাতির রেখা,
কবরের পাশে জ্বালাইয়া কেবা রচিতেছে কোন লেখা।
পাশে মুমূর্ষু রোগীর প্রদীপ নিবু নিবু হয়ে আসে,
উতল বাতাস ঘুরিয়া ফিরিয়া কাঁদিছে দ্বারের পাশে।
মরণের দূত আসিতে আসিতে থমকিয়া থেমে যায়,
শিথিল হস্ত হতে তরবারি লুটায় পথের গায়;
যুক্ত করেতে রচি অঞ্জলী বার বার ক্ষমা মাগে,
রাত্রের পরী মেলি দেহ ভার ঝিমায় ঘুমের রাগে।

ভোরের শিশির পদ্ম পাতায় রচিয়া শীতল চুম,
তাহার দুইটি নয়ন হইতে মুছাইয়া দিবে ঘুম।
রক্তোৎপল হইতে সিঁদূর মানাইতে তার ঠোঁটে,
শুক তারকার সোনার তরণী দীঘির জলে কে লোটে।

"এ লেডী উইথ এ ল্যাম্প"

৩

গভীর রাতের কালে,
কুহেলী আঁধার মূর্চ্ছিত প্রায় জড়ায়ে ঘুমের জালে ;
হাসপাতালের নিবিয়াছে বাতি ; দমকা হাওয়ার ঘায়,
শত মুমূর্ষু রোগীর কাঁদন শিহরিছে বেদনায়।
কে তুমি চলেছ সাবধান পদে বয়স-বৃদ্ধা-নারী,
দুই পাশে তব রুগ্ন-ক্লিন্ন শুয়ে আছে সারি সারি।
কাহার পাখাটি জোরে চলিতেছে, বালিশ সরেছে কার,
বৃষ্টির হাওয়া লাগে কার গায়ে শিয়রে খুলিয়া দ্বার।
ব্যাণ্ডেজ কার খুলিয়া গিয়াছে, কাহার চাই যে জল,
স্বপন দেখিয়া কেঁদে ওঠে কেবা, আঁখি দুটী ছল ছল।
এ সব খবর লইতে লইতে চলিয়াছ একাকিনী,
দুঃখের কোন সান্ত্বনা তুমি, বেদনায় বিষাদিনী।
গভীর নিশীথে, অনেক উর্দ্ধে জ্বলিছে আকাশে তারা,
তোমার এ স্নেহ মমতার কাজ দেখিতে পাবে না তারা ;
রাত-জাগা পাখী উড়িছে আকাশে, জানিবে না সন্ধান,
রাত-জাগা ফুল ব্যস্ত বড়ই বাতাসে মিশাতে ঘ্রাণ।
তারা কেহ আজ জানিতে পাবে না, তাহাদেরই মত কেহ,
সারা নিশি জাগি বিলাইছে তার মায়েলী বুকের স্নেহ।

এই বিভাবরী বড়ই ক্লান্ত বড়ই স্তব্ধতম,
উতলা বাতাস জড়াইয়া কাঁদে আঁধিয়ার নির্ম্মম।
মৃত্যু চলেছে এলায়িত কেশে ভয়াল বদন ঢাকি,
পরখ করিয়া কারে নিয়ে যাবে কারে সে যাইবে রাখি।
মহামরণের প্রতীক্ষাতুর রোগীদের মাঝখানে,
মহীয়সী তুমি জননী মূরতি আসিলে কি সন্ধানে!
জীবন-মৃত্যু মহা-রহস্য তুমি কি যাইবে খুলি,
ধরণীর কোন্ গোপন কুহেলী আজিকে লইবে তুলি।
যে বৃদ্ধ-কাল সাক্ষ্য হইয়া আছে মানুষের সাথে,
তুমি কি তাহার বৃদ্ধা সাথিনী আসিয়াছ আজ রাতে?
নিখিল নরের আদিম জননী আজিকে তোমার বেশে
রুগ্ন তাহার সন্তানদেরে দেখিয়া নিতেছে এসে।
নিরালা আমার শয্যার পাশে তোমার আঁচল-ছায়,
স্তব হয়ে আজ জড়ায়ে রহিতে বড় মোর সাধ যায়!

৪

ওধারের বেডে আসিল বালক, মটরের ধাক্কায়,
ক্ষতবিক্ষত, রক্তমাখান কচি তার দেহটায়।
চিৎকার করি কাঁদিত কেবল, আম্মাগো কোথা গেলে,
একেলা যে আমি থাকিতে পারিনা তোমারে কাছে না পেলে?
কাঁচা মুখখানি মমতা জড়ানো, জননী স্নেহের ভরে,
যে চুমায় তারে জাগায়েছে ভোরে আছে তা অধর ভরে।
ঘায়েতে তাহার ওষুধ মাখাতে, চিৎকারি কেঁদে ওঠে,
মায়ের আগেতে নালিশ জানায়, বোঝেনা কিছুই মোটে।
আম্মাগো তুই কোথা গেলি আজ, ওরা যে আমারে মারে,
ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে আমার ব্যথা দেয় বারে বারে।
আমি বাড়ী যাব—আমি বাড়ী যাব, তোরে শুধু কাছে পেলে,
সব যন্ত্রণা জুড়াইবে মাগো তোর বুকে বুক মেলে।

সারাদিন ভরি কতই যে কাঁদে, বড় ভাই তার আসে,
অশ্রু সিক্ত নয়নে বসিয়া রহে বিছানার পাশে।
ডাকিয়া সেদিন বলিলাম তারে, মায়েরে সঙ্গে করে
আনেন না কেন? সারাদিন খোকা কাঁদে যে তাহার তরে।
ম্লান হাসি হেসে কহিল ভাইটী, আমরা যে খানদান,
আমাদের মেয়ে হেথায় আসিলে ভীষণ অসম্মান।
রাতের বেলায় সকল বেডের রোগীরা ঘুমায়ে পড়ে,
খোকাটী কেবল চিৎকারি কাঁদে মায়েরে তাহার স্মরে।
প্রহরের পর প্রহর চলেছে, আম্মাগো কাছে আয়,
এত ডাক ডাকি তবুনা আসিস আমার যে জান যায়।

প্রহরের পর প্রহর চলেছে, আম্মাগো মোর ঘুড়ী,
পূবের ঘরেতে রেখে দিস যেন কেউ নাহি করে চুরি।
মারবল আর পেন্সিল ছুটো, কখানা টুকরো কাঁচ,
সাবধানে তুই রাখিস যেন না কেউ পায় তার আঁচ।
প্রহরের পর প্রহর চলেছে, আম্মাগো কাছে আয়,
কে যেন আমারে ধরিতে আসিছে ভীষণ চেহারা হায় ;
আম্মাগো কারা আমারে মারিছে, প্রহর চলেছে বেয়ে,
কাঁদিছে উতল রাতের পবন বড় যেন ব্যথা পেয়ে।

আমি দেখিতেছি বেঘুম শয়নে সুদূর হেরেম কোণে,
জাগিছে জননী, নিশির প্রদীপ জাগিছে তাহার সনে।
জাগিছে জননী, রাত-জাগা পাখী, রহিয়া রহিয়া জাগে,
রাত-কুসুমের উদাস গন্ধ চিরিতেছে বুকটাকে।
জাগিছে জননী, ছুই হাতে যদি পারিত ছিঁড়িয়া দিতে,
ছেলে হতে তার কোন ব্যবধান রাখিত না ধরণীতে।
পরদা প্রথার যে মিথ্যা আজি ছুলালেরে তার হায়,
এমনি করিয়া করেছে পৃথক ভাঙ্গিত যে আজি তায়।
আহারে মায়ের দীরঘ নিশাস কোথাও নাহিক লাগে,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আপনারি বুকে আরও ব্যথা হয়ে দাগে।
ধীরে ধীরে দীপ নিবিয়া আসিল ম্লান হয়ে এল আলো,
নিবিড় নীরব নিথর পাথারে জড়ালো রাতের কালো।
সব অভিযোগ ব্যথাতুর সেই বালকের মুখ হতে,
ধীরে ধীরে ধীরে ভেসে গেল কোন মহানীরবতা স্রোতে।
কোথা সেই স্বর থামিল যাইয়া, বহু বহু যুগ আগে—
যারা মরিয়াছে কঠিন পীড়নে সমাজ নীতির দাগে ;
যারা সহিয়াছে সহস্র ব্যথা ভাষাহীন বেদনায়,
মূক বালকের বেদনা মিলিল সে মহা নীরবতায়।

রজনী-গন্ধার বিদায়

৫

শেষ রাত্রের পাণ্ডুর চাঁদ নামিছে চক্রবালে,
রজনী-গন্ধা রূপসীর আঁখি জড়াইছে ঘুম-জালে।
অলস চরণে চলিতে চলিতে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে,
শিথিল শ্রান্তি চুমিছে তাহার সারাটি অঙ্গ ধরে!
উতল কেশেরে খেলা দিতে শেষ উতল রাতের বায়ু;
ঘুমাতে ঘুমাতে কাঁপিয়া উঠিছে স্মরিয়া রাতের আয়ু!
রজনী-গন্ধা রাতের রূপসী ঝুমিছে শ্রান্তি ভরে
অঙ্গ হইতে ঝরিছে কুসুম একটি একটি কোরে।

শিয়রে চাঁদের দীপটি ঝুমিয়া হইয়া আসিছে ম্লান,
রাত-বিহগীর কণ্ঠে এখন মৃদু হোয়ে এল গান।
পূর্ব্ব তোরণে আসিছে রূপসী রঙিন উষসী-বালা,
হস্তে লইয়া রাঙা দিবসের অফুট কুসুম-ডালা।
রজনী-গন্ধা ঘুমায় আলসে শিথিল দেহটী তার,
লুটাইয়া পড়ে বৃন্তশয়নে স্বপন-নদীর পার।

ভুবন ভোলানো মরি মরি ঘুম—অপরূপ, অপরূপ!
বিধাতা বুঝিবা ধ্যান করিতেছে যুগ যুগ রহি চুপ!

এ-রূপ মহিমা সহিতে পারে না, ভোরের রূপসী উষা,
রজনী-ফুলের অঙ্গ হইতে হরিয়া লইছে ভূষা !
শাড়ীতে তাহার তারা ফুলগুলি দলিয়া পিষিছে পায়ে,
ভেঙেছে রাতের পাখীর বাঁশরী উদাস বনের বায়ে !
শিয়রে চাঁদের মণি দীপ-খানি থাপড়ে নিবায়ে দিল,
অঙ্গ হইতে শিশির ফোঁটার গহনা কাড়িয়া নিল।

থামিল বনের ঝিঁঝির কণ্ঠে ঘুম পাড়ানিয়া সুর,
জোনাকী পরীরা দীপগুলি লয়ে চলিল গহন-পুর।
মৃত আত্মারা কবরে লুকাল, মহা রহস্য তার
আঁচলে জড়ায়ে ধীরে ধীরে ধীরে রজনী রুধিল দ্বার।
চারিদিকে নব আলোকের জয় ; চির পরিচিত সব,
মহা কোলাহলে আরম্ভ হলো দিনের মহোৎসব।
এখন শুধুই লোক জানা জানি মুখ চেনা চিনি আর,
দেনা-পাওনার হিসাব করিয়া 'বানিয়া' খুলিল দ্বার।

কোথায় ঘুমাল রজনী-গন্ধা কি-বা রহস্য-জাল,
সারা রাতি তারে জড়াইয়াছিল ? কে শোনে সে জঞ্জাল
রাতের রজনী-গন্ধা ঘুমায়, চির বিস্মৃতি-পুরে,—
তবু রয়ে রয়ে কি করুণ বাঁশী বেজে ওঠে বহু দূরে !

খৃষ্ট

কবে এসেছিলে মেষের চালক জেরুশালেমের আঙুর লতার বনে,
মরুর বাতাস খেলাইছে দোলা নব উদ্গত যবের পাতার সনে।
বেবিলন নারী আনমনা হয়ে দাঁড়ায়ে রহিত ধরিয়া কূয়ার দড়ি,
মিহিস্থরী গান রঙিন ঠোঁটের বাঁধন ছিঁড়িত তব আগমন স্মরি।
নগরবাসীরা মাথার পাগড়ী বিছাইয়া দিয়া যৈতুন পথ-ছায়,
আগ্রহে তারা বসিয়া রহিত সেই পথে যদি মানব বন্ধু যায়।

হারাণ মেষের সন্ধানে তুমি কাঁদিয়া ফিরেছ তুনিয়ার ঘরে ঘরে,
তুটি আঁখি হতে অশ্রু ঝরিত হতভাগা এই মানবের কথা স্মরে।
জেলেরা কিনারে তরী ভিড়াইয়া অবাক হইয়া শুনিত তোমার মুখে,
আকাশ হইতে আসিছে নামিয়া সোনার স্বর্গ হতভাগাদের তুখে।
তুঃখী যাহারা আনন্দ কর, কারণ তাহারা হাসিবে তুখের পরে,
যারা ক্ষুধার্ত্ত ভয় নাহি নাহি আসিছে আহার সোনার পাত্র ভরে।
কাঁদিতেছ যারা আর কাঁদিওনা, হাসি ঝরিতেছে চাঁদের কলসী বেয়ে,
মহামানবের আসিয়াছে দিন, ব্যথিত তাপিত দেখ দেখ আজ চেয়ে।
জনারের খেতে লাঙল থামায়ে গ্রাম্য চাষীরা শুনিত তোমার বাণী,
কাফেলার পথে যত মরুচারী স্মরণ করিত তব হাসি মুখখানি।
ক্রীতদাসী তার মনিবের হাতে হাসিয়া সহিত পীড়নের শত জ্বালা,
—তুমি আসিয়াছ মানবের সখা হস্তে লইয়া স্বরগের ফুলমালা।

মানব বন্ধু ! ফিরে এস আজ—আমাদের দেশে ফিরে এস একবার,
আষ্টে পৃষ্ঠে চেপেছে মোদের পর-দেশীদের শাসনের মহাভার।
ভারত জুড়িয়া যত ক্রীতদাস গোলামখানায় সহিতেছি শত জ্বালা,
কি লিখিব আজ লেখনী কাঁপিছে, মুখ বাঁধিয়াছে শাসনের শত তালা।
আমরা তোমার হারাণ শাবক, উচ্চে কাঁদিয়া তোমারে যে দিব ডাক,
কণ্ঠ মোদের চাপিয়া ধরেছে বিদেশী রাজার শাসনের রশী-লাখ।
ফিরে চাহ এই ভারতের পানে, কাঁদে মরিয়ম শৃঙ্খল পরি পায়,
তব নাম নিয়ে ভণ্ডেরা আজি আঘাত হানিছে তার ছেলেদের গায়।

১৯৩৫

প্রাচ্য গুরু জামালুদ্দীন

তখন ওঠেনি ফজরের তারা, তখনো জাগেনি প্রাণ,
যুগের জমাট আঁধার গহনে ঘুমায় গোরস্থান।
মিশরের মমী ঘিরিয়া নাচিছে রাতের পিশাচ দল,
আল্‌হামরার মিনার ভাঙিয়া তুলিছে বাতাস খল।

কে তুমি জাগিলে সে ঘোর রাত্রে তুহাতে মশাল ধরি,
তুলিয়া উঠিল শত তরঙ্গে স-তিমির বিভাবরী।
উচ্চ কণ্ঠে হাঁকিলে আজান, সুর বিহঙ্গ হয়ে,
তোমার বাণীরে চঞ্চুতে ধরি ছড়াইল লোকালয়ে।
জাগিল মেহেদী-রঙিন-ফজর প্রাচীর গগন তলে,
আসিল উষসী সীমন্তে জবাকুসুমের দ্যুতি জ্বলে।
তুমি সেই কালে বিদায় লইলে হে যুগের শুকতারা,
তব বাঞ্ছিত জ্যোতির আগমে থামাইলে পথ ধারা।
জেগেছে মিসর জেগেছে তুর্ক জাগে হিন্দুস্থান,
নীল নদী আর আরব সাগরে উঠেছে নবীন বান।
সাকী সিরাজীর খোয়াব ভাঙিয়া পারস্য আজি গাহে,
আফিঙের ঘুম ভাঙিয়া কাবুল চারিদিক পানে চাহে।

কোথা সে তাপস, যুগের স্রষ্টা কোথা সেই মুসাফির,
যার আহ্বানে 'সুবেহ সাদেক' জাগাইল ধরণীর।
বিস্ময়ে সবে উঠিছে কাঁদিয়া যার ডাক শুনি হায়
জাগিল মানব সে কেন আজিকে ঘুমায় মরণ-ছায়।

বাস্তু-ত্যাগী

দেউলে দেউলে কাঁদিছে দেবতা পূজারীরে খোঁজ করি,
মন্দিরে আজ বাজেনাক শাঁখ সন্ধ্যা সকাল ভরি।
তুলসীতলা সে জঙ্গলে ভরা, সোনার প্রদীপ লয়ে,
রচে না প্রণাম গাঁয়ের রূপসী মঙ্গল কথা কয়ে।
হাজরা তলায় শেয়ালের বাসা, সেওড়া গাছের গোড়ে,
সিঁদুর মাখান, সেই স্থান আজি বুনো শুয়োরেরা কোড়ে।
আঙিনার ফুল কুড়াইয়া কেউ যতনে গাঁথে না মালা,
ভোরের শিশিরে কাঁদিছে পূজার দূর্ব্বা শীষের থালা।
দোল-মঞ্চ যে ফাটলে ফাটিছে, ঝুলনের দোলাখানি,
ইঁদুরে কেটেছে, নাটমঞ্চের উড়েছে চালের ছানি।

কাক-চোখ জল পদ্মদীঘিতে কবে কোন রাঙা মেয়ে,
আলতা ছোপান চরণ দুখানি মেলেছিল ঘাটে যেয়ে।
সেই রাঙা রঙ ভোলে নাই দীঘি, হিজলের ফুল বুকে,
মাখাইয়া সেই রঙিন পায়েরে রাখিয়াছে জলে টুকে।
আজি ঢেউহীন অপলক চোখে করিতেছে তাহা ধ্যান,
ঘন-বন-তলে বিহগ কণ্ঠে জাগে তার স্তব গান।
এই দীঘি জলে সাঁতার খেলিতে ফিরে এসো গাঁর মেয়ে,
কলমি-লতা যে ফুটাইবে ফুল তোমারে নিকটে পেয়ে।
ঘুঘুরা কাঁদিছে উহু উহু করি, ডাহুকের ডাক ছাড়ি,
গুমরায় বন সবুজ শাড়ীরে দীঘল নিশাসে ফাঁড়ি।

ফিরে এসো যারা গাঁও ছেড়ে গেছো, তরু লতিকার বাঁধে,
তোমাদের কত অতীতদিনের মায়া ও মমতা কাঁদে।
সুপারির বন শূন্যে ছিঁড়িছে দীঘল মাথার কেশ,
নারকেল তরু ঊর্দ্ধে খুঁজিছে তোমাদের উদ্দেশ।

বুনো পাখীগুলি এডালে ওডালে কই কই রে কাঁদে,
দীঘল রজনী খণ্ডিত হয় পোষা কুকুরের নাদে।
কার মায়া পেয়ে ছাড়িলে এদেশ, শস্যের থালা ভরি,
অন্নপূর্ণা আজো যে জাগিছে তোমাদের কথা স্মরি।
আঁকা বাঁকা বাঁকা শত নদী পথে ডিঙ্গি তরীর পাখী,
তোমাদের পিতা-পিতা-মহদের আদরিয়া বুকে রাখি;
কত নামহীন অথই সাগরে যুঝিয়া ঝড়ের সনে,
লক্ষ্মীর ঝাঁপি লুটিয়া এনেছে তোমাদের গেহ-কোণে।
আজি কি তোমরা শুনিতে পাওনা সে নদীর কলগীতি,
দেখিতে পাওনা ঢেউএর আখরে লিখিত মনের প্রীতি?
হিন্দু মুসলমানের এ দেশ, এ দেশের গাঁর কবি,
কত কাহিনীর সোনার সূত্রে গেঁথেছে সে রাঙা ছবি।
এ দেশ কাহারো হবে না একার, যতখানি ভালোবাসা,
যতখানি ত্যাগ যে দেবে, হেথায় পাবে ততখানি বাসা।
বেহুলার শোকে কাঁদিয়াছি মোরা, গংকিনী নদী সোঁতে,
কত কাহিনীর ভেলায় ভাসিয়া গেছি দেশে দেশ হতে।
এমাম হোসেন শকিনার শোকে ভেসেছে হলুদ পাটা,
রাধিকার পার নূপুরে মুখর আমাদের পার-ঘাটা।
অতীতে হয়ত কিছু ব্যথা দেছি পেয়ে বা কিছুটা ব্যথা,
আজকের দিনে ভুলে যাও ভাই সে সব অতীত কথা।
এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি, নূতন দৃষ্টি দিয়ে,
নূতন রাষ্ট্র গড়িব আমরা তোমাদের সাথে নিয়ে।
ভাঙ্গা ইস্কুল আবার গড়িব, ফিরে এসো মাষ্টার!
হুঙ্কারে ভাই তাড়াইয়া দিব কালি অজ্ঞানতার।
বনের ছায়ায় গাছের তলায় শীতল স্নেহের নীড়ে,
খুঁজিয়া পাইব হারাইয়া যাওয়া আদরের ভাইটিরে!
রচনাকাল—১৯৪৭

জাহানারার কবরে

শাহজাহানের আদুরে দুলালি ! হেথা কবরের ঘরে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে কিসের স্বপন দেখিতেছ যুগ ভরে।
গোলাপ ফুলের তুমি প্রিয় সখী, তোমার ফুলের গায়
কোন্ সে রঙের আঘাত পাইয়া ঘুমাইলে মূর্চ্ছায়।
কোন্ সে বাঁশীর বাতাস আসিয়া রঙিন্ পাখীর পাখে,
কিবা স্বপনের ঘুমে জড়াইল তব ফুল-দেহটাকে।
কোন্ লুবানের সুবাসে কন্যা মুদিলে সুরমা-আঁখি,
কোন্ চাঁদিমার জোছনা লইলে সুদীর্ঘ রাতে আঁকি।
কত বুলবুলি ডাকিল তোমারে, জেগে ওঠ ফুল-বোন,
কত যে উষসী রঙের আখরে সাজাল ধরার কোণ।
তোমার ফুলের যুগ যুগ ঘুম কভু কি পোহাবে নাগো,
কারে সাথে লয়ে কহ তুমি মেয়ে সুদীর্ঘ রাতি জাগো !

রঙমহলের গোলাব সায়রে ভেসে উঠেছিলে পরি !
জল যে হইত আতর তোমার মেহেদী চরণ ধরি।
তব নিশ্বাসে ছড়াত লুবান, কণ্ঠেতে বুল্‌বুলি,
সোনার অঙ্গে জড়ায়ে ঘুরিত রামধনু রঙ্‌গুলি।
কি ছিল তোমার অভাব কন্যা, রঙে মণি মাণিকের,
প্রদীপ জ্বালায়ে বাড়াতে পারিতে সুষমা শ্রীঅঙ্গের।

কি ছিল তোমার অভাব কন্যা, চাঁদের মুকুর লয়ে,
অধরখানিরে দেখিতে দেখিতে তুমি যেতে চাঁদ হয়ে ;
রঙমহলের এত যে বিলাস, না চাহিতে সাধ পোরে,
বাসনা সদাই দাসী হয়ে যারে যাচিত বাসনা করে ;
কি ক্ষুধা তাহার মিটিত না তবু ? মাণিকের ঝিলিমিলি,
হেরেমের হুরি, তোমারে ভুলাতে পারিল না নিরিবিলি।

কোথায় কাঁদিছে চির ক্ষুধাতুর, গরীবের কুঁড়ে ঘরে,
চিৎকারে শিশু রুগ্ন মায়ের শুষ্ক যে স্তন ধরে।
মহা অভাবের সঙ্গে যুঝিয়া হয়রান হয়ে হায় !
যুগে যুগে তারা ঝরিয়া পড়িছে মাটির শীতল ছায়।
তাহাদের কথা স্মরিয়া স্মরিয়া তোমার বালিকা মন,
রুদ্ধ-দুয়ার হেরেমের কোণে করিত যে ক্রন্দন।
হয়ত তাদেরি বোন হতে আর জননী হইতে আর ;
আকুলি বিকুলি করিত তোমার স্নেহ-ভরা বুক মার।
হেরেমের মেয়ে ! বাহিরে আসিতে সাধ্য ছিল না কভু,
অনাহারী ভাই বোনদের কথা ভুলিতে পারনি তবু।
মরণের কালে অভিমানী মেয়ে লিখে গেলে কবিতায়,
আমার কবর রচিও তোমরা দূর্ব্বা ঘাসের ছায়।
যেথায় আমার গরীব ভাইরা ঘুমায় মাটির তলে,
ছোটখাটো কত অপূর্ণ আশা নিভেছে তাদের কোলে।
জীবনে যাদের পাইনিক কাছে, যেন মরণের পরে,
একত্র হয়ে থাকিবারে পারি তাহাদের কাছে করে।
কবরে আমার গড়নাক তাজ, মর্ম্মর দিও নাক,
শান্ত শীতল দূর্ব্বা শীষেরা স্নেহেতে জড়ায়ে থাক।

শাহজাহানের আদুরে দুলালি ! শাহাজাদী জাহানারা !
আর কি কখনও জাগিবেনা তুমি লইয়া জীবন-ধারা ?

কতদিন গেল, মোগলের সেই গৌরব দিনগুলি,
নিঠুর কালের চরণে গুঁড়ায়ে হয়েছে ধূসর ধূলি।
সব-হারা যত মৃত ভাইদের লাসগুলি বুকে করি,
গহন কবরে কাটিতেছে তব সুদীর্ঘ বিভাবরী।
সে রাতের কি গো শেষ হবে নাক, বারেক দেখ গো চেয়ে,
সর্ব্ব-হারারা জাগে দিকে দিকে জীবনের গান গেয়ে।
এখন তাহারা পদানত হয়ে রবে না ধরার কোলে,
অত্যাচারিত চির-বঞ্চিত জাগে জীবনের দোলে।
আজিকে এমন বোন চাই মোরা, তাতারী মরুর ঝড়ে,
বেদেনীর মত আগে আগে চলে বিদ্যুৎ লয়ে করে।

চাকর

সামসু আছিল বাসার চাকর, একটি বছর ধরে,
সুদূর প্রবাসে কাটায়েছি কাল তাহারে সঙ্গে করে।
নির্জ্জন স্থানে বাসাটি আমার, শুধু দুইজন প্রাণী ;
সুখে আর দুখে একটি বছর নীরবে গিয়াছে টানি।
ছুতো নাতা কাজে গলদ ধরিয়া কত যে বকেছি তায়,
কত অনাদর অপমান সে যে নীরবে সয়েছে হায়।
ক্ষুদ্র একটু মিষ্টি কথায়, ছোটখাটো উপহারে
এত খুসী হত রাজ্য যেন বা দান করিয়াছি তারে।

আমার বাসার চাকর সে ছিল, কাজ করে মাহিনায়,
দীর্ঘ একটি বছর উহার বেশী ভাবি নাই তায়।
গৃহ হতে মোর চিঠি আসিয়াছে—শুভ ও অশুভ মিলে,
আশা নিরাশার জোয়ার ভাটার দোলা লাগিয়াছে দিলে
ভাগ্নী লিখেছে, মেজো মামুজান জলছবি মোর চাই,
ভাগ্নে লিখেছে, পাশ করিয়াছি কি দিবে জানাবে তাই।
বড় ভাইজান লিখেছে চিঠিতে, পিতার হয়েছে জ্বর,
কিছু টাকা তুমি পাঠাইয়া দিবে টেলিগেরামের পর।
পোষ্ট অফিসে ছোটাছুটি করি, কাটাই বে-ঘুম রাতি,
যতনা অশুভ চিন্তার রাশি আমারে পেয়েছে সাথী।
জননী এখন কি করিছে মোর, বোনেরা করিছে কিবা,
পদ্মানদীর ওপারে এখনি হয়ত ডুবিছে দিবা।
ডাক্তারবাবু আসিছে হয়ত, কি বলিবে রোগী দেখে,
একখানি ছবি মুছিয়া হয়ত আর খানি লই এঁকে।

সামসু আমার বাসার চাকর,—শুধু সে চাকর হায়,
শুধু কাজ করে, আমার মতন ভাবিতে হয় না তায়।
দীর্ঘ ও ছোট কত চিঠি মোর ছাড়িয়াছে সে যে ডাকে,
একদিনও আমি একখানা চিঠি লিখিতে দেখিনি তাকে।
কালকে বিকালে তাহার নামেতে এসেছে টেলিগ্রাম,
মায়ের তাহার ভীষণ অসুখ আসে যেন অবিলাম।
টেলিগ্রামের কাগজখানিরে ধরিয়া সামনে মোর,
মলিন বয়ান ভিজাইয়া দিল লইয়া নয়ন লোর।

দিনু তারে ছুটি, হিসাব নিকাশ কড়ায় ক্রান্তি গণে,
দিলাম বেতন বকসিস্‌ও কিছু দিলাম তাহার সনে।
বিদায় লইয়া চলে গেল সে যে সুদূর গাঁয়ের ঘরে,
নীরব দুখানি চরণ ফেলিয়া স্তব্ধ ধূলির পরে।

আমি দেখিতেছি স্বপ্ন নয়নে সুদূর গেহের ছায়,
রোগপাণ্ডুর আঁখি দুটি মেলি চাহিয়া রয়েছে মায়।
আর কতখণে আসিবে দুলাল, ভগ্ন আশাটি মার,
ঘরের বেড়ায় আঘাত পাইয়া ঘুরে আসে বার বার।
শিয়রে প্রদীপ জ্বলে নিবু নিবু, তাহার কাঁপন ঘায়,
অভাগিনী মার শেষ বাসনাটি বার বার মূরছায়।
সুদীর্ঘ পথ, দূর দূরান্ত, বন বনান্ত ছাড়ি,
সীমাহীন কত শস্য-হরিৎ মহাপ্রান্তর পাড়ি;
দূরে—বহু দূরে—কোথায় না জানি শেষ হইয়াছে তার,
কত খেয়াঘাট পদ্মের বিল গঙ্কিনী নদী পার;
সেইখান দিয়ে চলিয়াছে ছেলে, দিবস গড়ায়ে যায়,
আসে তারা-ভরা নিশি কুহকিনী আঁধারের পাখনায়;
প্রহরের পর প্রহর চলেছে দীর্ঘ নিশাসে দুলি;
চরণের তলে কেঁদে কেঁদে উঠে শুষ্ক পথের ধূলি।

তারাবি

তারাবি নামাজ পড়িতে যাইব মোল্লাবাড়ীতে আজ,
মেনাজদ্দীন কলিমদ্দিন আয় তোরা করি সাজ।
চালের বাতায় গোঁজা ছিল সেই পুরাতন জুতা জোড়া,
ধূলা বালু আর রোদ লেগে তাহা হইয়াছে পাঁচ মোড়া;
তাহারি মধ্যে অবাধ্য এই চরণ দুখানি ঠেলে,
চল দেখি ভাই খলিলদ্দিন লণ্ঠন-বাতি জ্বেলে!
ঢেলারে ডাক, লস্কর কোথা, কিনুরে খবর দাও,
মোল্লাবাড়ীতে একত্র হব মিলি আজ সারা গাঁও।

গইজদ্দিন গরু ছেড়ে দিয়ে খাইয়েছে মোর ধান,
ইচ্ছা করিছে থাপ্পড় মারি, ধরি তার দুটো কান।
তবু তার পাশে বসিয়া নামাজ পড়িতে আজিকে হবে,
আল্লার ঘরে ছোটোখাটো কথা কেবা মনে রাখে কবে!
মৈজদ্দিন মামলায় মোরে করিয়াছে ছারেখার,
টুটি টিপে তারে মারিতাম পেলে পথে কভু দেখা তার।
আজকে জামাতে নির্ভয়ে সে যে বসিবে আমার পাশে,
তাহারো ভালর তরে মোনাজাত করিব যে উচ্ছ্বাসে।
মাহে রমজান আসিয়াছে বাঁকা ঈদের চাঁদের নায়,
কাইজা ফেসাদ সব ভুলে যাব আজি তার মহিমায়।

ভুমুরদি কোথা, কাছা ছাল্লাম আম্বিয়া পুঁথি খুলে,
মোর রসুলের কাহিনী তাহার কণ্ঠে উঠুক দুলে।
মেরহাজে সেই চলেছেন নবী, জুমজুমে করি স্নান,
অঙ্গে পরেছে জোছনা নিছনি আদমের পিরহান।
নুহু আলায়হুছালামের টুপী পরেছেন নবী শিরে,
ইবরাহিমের জরির পাগড়ী রহিয়াছে তাহা ঘিরে।
হাতে বাঁধা তার কোরাণ তাবিজ, জৈতুন হার গলে,
শত রবি শশী একত্র হয়ে উঠিয়াছে যেন জ্বলে।
বুরহাকে চড়ে চলেছেন নবী কণ্ঠে কলেমা পড়ি,
দুগ্ধধবল দূর আকাশের ছায়া পথ-রেখা ধরি।
আদম ছুরাত বামধারে ফেলি চলে নবী দূর পানে,
গ্রহ তারকার লেখা রেখাহীন ছায়া-মায়া আসমানে।

তারপর সেই চৌঠা আকাশ, সেইখানে খাড়া হয়ে,
মোনাজাত করে আখেরী নবীজী দুহাত উর্দ্ধে লয়ে।
এই সে কাহিনী শুনিতে শুনিতে মোল্লা বাড়ীর ঘরে,
মহিমায় ঘেরা অতীত দিনেরে টানিয়া আনিব ধরে।

বচন মোল্লা কোথায় আজিকে সরু সুরে পুঁথি পড়ি,
মোর রসুলের ওফাত কাহিনী দিক সে বয়ান করি।
বিমারের ঘোরে অস্থির নবী, তাঁহার বুকের পরে,
আজরাল এসে আসন লভিল জান কবজের তরে।
আধ অচেতন হজরত কহে, এসেছ দোস্ত মোর,
বুঝলাম আজ মোর জীবনের নিশি হয়ে গেছে ভোর।
একটুখানিক তবুও বিলম করিবারে হবে ভাই!
এ জীবনে কোন ঋণ যদি থাকে শোধ করে তাহা যাই।

* * * *

মাটির ধরায় লুটায় নবীজী, ঘিরিয়া তাহার লাশ,
মদিনার লোক থাপড়িয়া বুক করে সবে হাহুতাশ।
আব্বাগো বলি, কাঁদে মা ফাতিমা লুটায়ে মাটির পরে,
আকাশ ধরণী গলাগলি তার সঙ্গে রোদন করে।
এক ক্রন্দন দেখেছি আমরা বেহেস্ত হতে হায়,
হাওয়া ও আদম নির্ব্বাসিত যে হয়েছিল ধরাছায় ;
যিশু-জননীর কাঁদন দেখেছি ভেস্তের পায়াধরে
ক্রুশ-বিদ্ধ যে ক্ষত বিক্ষত বেটার রোদন স্বরে।
আরেক কাঁদন দেখেছি আমরা নির্ব্বাসী হাজরার,
জমিনের পরে সেওলা জমেছে অশ্রু ধারায় তার ;
সবার কাঁদন একত্রে কেউ পারে যদি মিশাবার,
ফাতিমা মায়ের কাঁদনের সাথে তুলনা মেলে না তার।

আসমান যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল তাহার মাথায় হায়,
আব্বা বলিতে আদরিয়া কেবা ডাকিয়া লইবে তায়।
গলেতে সোনার হারটি দেখিয়া কে বলিবে ডেকে আর,
নবীর কনের কণ্ঠে মাতাগো এটি নহে শোভাদার।
সেই বাপজান জনমের মত গিয়াছে তাহারে ছাড়ি,
কোন সে সুদূর গহন আঁধার মরণ নদীর পাড়ি।
জজিরাতুল সে আরবের রাজা, কিসের অভাব তার,
তবু ভুখা আছে চার পাঁচদিন, মুছাফির এলো দ্বার ;
কি তাহারে দিবে খাইবারে নবী, ফাতেমার দ্বারে এসে ;
"চারিটি খোরমা ধার দিবে মাগো" কহে এসে দীন বেশে
সে মহা ভিখারী জনমের মত ছাড়িয়া গিয়াছে তায়,
আব্বাগো বলি এত ডাক ডাকে উত্তর নাহি হায়।

এলাইয়া বেশ লুটাইয়া কেশ মরুর ধূলার পরে,
কাঁদে মা ফতেমা, কাঁদনে তাহার খোদার আরস নড়ে।

কাঁদনে তাহার ছদন সেখের বয়ান ভিজিয়া যায়,
গৈজদ্দির পিতৃ-বিয়োগ পুন যেন উথলায়!
খৈমুদ্দিন মামলায় যারে করে ছিল ছারেখার,
সে কাঁদিছে আজ ফাতিমার শোকে গলাটি ধরিয়া তার।
মোল্লাবাড়ীর দলিজায় আজি সুরা ইয়াসিন পড়ি,
কোন দরবেশ সুদূর আরবে এনেছে হেথায় ধরি।
হনু তনু ছমু কমুরে আজিকে লাগিছে নূতন হেন,
আবু বক্কর ওমর তারেখ ওরাই এসেছে যেন।
সকলে আসিয়া জামাতে দাঁড়াল, কণ্ঠে কালাম পড়ি,
হয়ত নবীজী দাঁড়াল পিছনে ওদেরি কাতার ধরি।
ওদের মাথার শত তালী দেওয়া ময়লা টুপীর পরে,
দাঁড়াইল খোদা আরস কুরছি ক্ষণেক ত্যাজ্য করে।

* * * *

মোল্লা বাড়ীতে তারাবি নামাজ হয় না এখন আর,
বুড়ো মোল্লাজি কবে মারা গেছে, সকলই অন্ধকার।
ছেলেরা তাহার সুদূর সহরে বড় বড় কাজ করে,
বড় বড় কাজে বড় বড় নাম খেতাবে পকেট ভরে।
সুদূর গাঁয়ের কি বা ধারে ধার, তারাবি জমাতে হায়,
মোমের বাতিটি জ্বলিত, তাহা যে নিবেছে অবহেলায়।
বচন মোল্লা যক্ষ্মা রোগেতে যুঝিয়া বছর চার,
বিনা ঔষধে চিকিৎসাহীন নিবেছে জীবন তার।
গভীর রাত্রে ঝাউবনে নাকি কণ্ঠ রাখিয়া হায়,
হোসেন শহিদ পুঁথিখানি সে যে সুর করে গেয়ে যায়।
ভুমুরদি সেই অনাহারে থেকে লভিল শুলের ব্যথা,
চিৎকার করি আছাড়ি পিছাড়ি ঘুরিত সে যথা তথা।
তারপর সেই অসহ্য জ্বালা সহিতে না পেরে হায়,
গলে দড়ি দিয়ে পেয়েছে শান্তি আম্র গাছের ছায়।

কাছা ছাল্লাম পুঁথিখানি আজো রয়েছে রেহেল পরে,
ইঁদুরে তাহার পাতাগুলি হায় কেটেছে আধেক করে।
লস্কর আজ বৃদ্ধ হয়েছে, চলে লাঠিভর দিয়ে,
হনু তনু তারা ঘুমায়েছে গায়ে গোরের কাফন নিয়ে।

সারা গ্রামখানি থম থম করে স্তব্ধ নিরালা রাতে ;
বনের পাখীরা আছাড়িয়া কাঁদে উতলা বায়ুর সাথে।
কিসে কি হইল, কি পাইয়া হায় কি আমরা হারালাম,
তারি আফসোশে শিহরি শিহরি কাঁপিতেছে সারা গ্রাম
ঝিঁঝিরা ডাকিছে সহস্র দিকে, এ মূক মাটির ব্যথা,
জোনাকি আলোয় ছড়ায়ে চলিছে বন-পথে যথা তথা।

মা

মা আর তাহার ছেলে,
দুই দেশে তারা দুইজন রহে নয়নের জল মেলে।
এক-ই আকাশের দুইখানা তীর লুটায়েছে দুই দেশে,
মাঝখানে দোলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ লাল সাদা নীলে হেসে।
এপার ওপার দুটী আকাশের উঁচু নীচু পথ ধরি,
দুইটী বিরহী কাঁদিছে নিঝুম—এ উহারে মনে করি।

চিঠি লেখা-লেখি হয় ;
ছেলে কয়—মাগো তোমারে ছাড়িয়া পরাণ যে মানে নয়।
সহরে আমার মন টেকেনা যে, লেখাপড়া লয়ে থাকি,
এত কাজ তবু মনে হয় বসে 'মা' বলে খানিক ডাকি।
মায় চিঠি লেখে, দূর গাঁও থেকে—সেই ঘন কালো গাঁও,
নিবিড় পাতার মমতা-মাখান সে মায়াবিনীর গাও ;
—সেই দেশ হতে চিঠি লেখে মাতা,—সে দেশেরই যেন মায়া,
সবখানি আজ উজাড় করিয়া নিয়েছে চিঠির কায়া।—
মায় চিঠি লেখে সেই দেশ হতে, ছোট নদীটীর তীরে,
সরু পথ গেছে, তার পাশে ঘর, আকাশ তাহার শিরে।
সেই পথ দিয়ে কলস বাজায়ে রোজ জলে যায় মাতা,
সব কিছু তার চিঠির বুকেতে ছবির মতন পাতা।

সাদা ধবধবে উঠানের পরে ছোট ভাই-বোন খেলে,
দেবতারা বুঝি তারা-ফুলগুলো মুঠি মুঠি গেছে ফেলে।
সেইখান থেকে চিঠি আসে মার,—বাছারে আমারো মন,
পরদেশে তোরে ফেলিয়া আজিকে করিতেছে ক্রন্দন।

মা আর তাহার ছেলে,
মাঝে কাঁদিতেছে মহা দূরত্ব যোজনের পথ মেলে।
এদেশ ওদেশ, তাহারি উপরে অনন্ত শূন্যতা,
মেঘের লহর ফেনিয়ে উঠিছে স্মরি এই আকুলতা ;
মাতা এই দেশে, ছেলে ওই দেশে, উপরে গগন গায়,
পাখায় পাখায় মালিকা গাঁথিয়া পাখীরা সুদূরে ধায়।
ওই পথ দিয়ে চাঁদ ভেসে যায়, ভেসে যায় তারা-বাতি,
—রবি চলে যায় গড়ায়ে গড়ায়ে রৌদ্রের জাল পাতি।
ওই খান দিয়ে মেঘ ভেসে যায় বরণে বরণে হাসি,
—ভেসে চলে যায় মেঠো রাখালের করুণ সুরের বাঁশী।
শুধু ওই দেশে ছেলে থাকে, আর এই দেশে থাকে মাতা,
ভাবে আকাশের নীল শামীয়ানা ছিঁড়ে করি ছাতানাতা।

মা আর মায়ের ছেলে,
দুই দেশে তারা ঘুমোতে ঘুমোতে নয়নের পাতা মেলে।
মা দেখে স্বপন, ছেলেও দেখেবা—কারা সে স্বপন আনে ;
রাতের শিশির রাতের জোছনা তারা এ সকল জানে।

মায়ের মূরতি খানা,
শিশিরের সাথে গড়াইয়া যায় যেথায় ছেলের থানা।
—সে মায়ের ছবি, মুখখানি মার ভরা আদরের ডাকে,
সোনা যাদুমণি সে বলে সদাই, ছেলে দেখিতেছে তাকে।

বাহুখানি মার, গায়েতে ছেলের যে আদর লেগে আছে,
সব যেন ওই কোমল ত্বখানি বাহু বেয়ে আসিয়াছে।
সেই বাহু দিয়ে জড়াইয়া ধরে ছেলের সারাটী গাও,
—ছেলে ঘুম যায়, আকাশেতে ভাসে চন্দ্রের বাঁকা নাও।

ছেলে ভেসে যায়, জননীর দেশে, জোছনার গাঙ দিয়া,
—দূর গেঁয়ো ঘরে ঘুমায়েছে মাতা গেঁয়ো ঘর উজলিয়া ;
বনে ডাকিতেছে ডাহুক-ডাহুকী, কানাকুয়া ডাকে দূরে,
গাছেরা বিলায় শিশিরের ফোঁটা পাতায় পাতায় পুরে।
সেই পথ দিয়ে ভেসে যায় ছেলে, জননীর কাছে যায়,
—সেই ছেলে—যারে আদরে আদরে কোলে নাচায়েছে মায়।
ভেসে যায় ছেলে সেই পথ দিয়ে, শিশুকাল উতরিয়া,
চির-চঞ্চল বালকের দেশে যায় যেন তরী নিয়া।
সেই ছোট বেলা—পাড়ায় পাড়ায় কল-কোলাহল করি,
সন্ধ্যা বেলায় ঘরে ফিরে-আসা মা ডাকেতে বুক ভরি।
এই সব দেশ পেরিয়ে পেরিয়ে ছেলে আসে মার কাছে,
সারা গায়ে তার মায়ের স্নেহের আলপনা লেগে আছে।

এই ধরণীতে আর কারো নয়, সবখানি ও যে মার,
সারা গায়ে তারে জড়াইয়া ধরি কহে মাতা বার বার।
আর কারো দান ওকি ভালবাসে ? আর কারো স্নেহ-ডাক
কে বলেছে আজ পুরাইতে পারে মায়ের ব্যথার ফাঁক ?
মা বলে,—বাছারে, কাজল করিয়া আঁখিতে আঁকিব তোরে,
কেউ নিতে এলে বুকের আঁচলে ছাপায়ে রাখিব ধরে।
পূবে রবি হাসে, তুইখানি দেশে জাগে ছেলে আর মাতা,
সারা দিন ভরি পড়ে পড়ে দেখে তুটী স্বপনের খাতা।

মা আর মায়ের ছেলে,
দুই দেশে তারা দুইজনে কাঁদে এ আজ উহারে ফেলে।
মাঝখানে আছে যোজনের পথ, তারি পরে পাও ধরি,
চলে যায় কত বিদেশী পথিক বিরহের গান করি।
সেই পথ দিয়ে চলে মরীয়াম, ফতেমা কাঁদিয়া চলে,
শচী জননীর নয়নের জলে সে পথের ধূলি গলে ;
সেই পথ দিয়ে বনবাসে যায় রাম লক্ষ্মণ সীতা,
সেই পথে যেন জ্বালাইয়া রাখে কোশল্যা-রাণী চিতা।
তারি ধূলি পরে গড়াগড়ি যায় শচীর নিমাই আজি,
গেঁয়ো কৃষাণের কণ্ঠে কণ্ঠে বার-মাসী গানে বাজি,
মা আর মায়ের ছেলে,
তারি সাথে দেয় আপন মনের রোদনের ধারা ঢেলে।

বানর-যূথ

গহন বনের মাঝে,
বুড়ো বটগাছ শিকড়ে-বাকলে জড়ায়েছে নানা সাজে।
জীর্ণ শীর্ণ বুকের পাঁজর গিয়াছে হইয়া ফাঁক,
তাহার মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে কোকিল শালিখ কাক।
সাপের খোলস ঝুলে আছে কোথা, কোথাও শুকনো ডাল,
মহাযোগী বট ধ্যানে নিমগ্ন কত যুগ কত কাল।

সেদিন প্রভাতে বেড়াতে বেড়াতে হেরিলাম তার তলে,
বানরের দল ঘুমায়ে রয়েছে ধরিয়া এ ওর গলে।
কোন বা জননী, সন্তান মুখে চুমু দিয়ে দিয়ে আর,
সাধ মেটেনাক, নানা ভাবে তারে আদরিছে বারবার।
কোন বা জননী ঘুমায়ে নিঝুম, সন্তানগুলি উঠে,
স্বেচ্ছায় দুধ করিতেছে পান মার স্তন হতে লুটে।
কোন বা দুষ্ট সন্তান তার চোখে ঘুমন্ত মার,
আঙুল বুলায়ে ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছে জাগাবার।
ঘুমন্ত মাতা হয়ত এখনো স্বপ্ন জড়িত চোখে,
ছেলেদের তরে কোন সুখ নীড় আঁকিছে বা আশা-লোকে।
কোন কোন মাতা ছোট ছেলেটিরে জাগায়ে দিতেছে মাই,
আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদে হিংসায় পাশে তার বড় ভাই।

মাঘের প্রভাত, কনকনে হাওয়া বহিতেছে শীত করি,
শুয়ে আছে ওরা আদরে সোহাগে কাছাকাছি জড়াজড়ি।
স্নেহ-মমতার এমন দৃশ্য নির্জ্জনে আঁকি আর,
শত ফুল আঁখি মেলিয়া ইহারে দেখিতেছে বারবার।
প্রভাতের রবি আসিতে আসিতে থেমে যায় পথ ধারে,
কুয়াসা চাদরে রশ্মিরে ঢাকি রাখে যতখণ পারে।
বন তার শাখা-বাহু বাড়াইয়া দিনেরে আড়াল করে,
হয়ত বাসনা ঘুমাক উহারা আরো কিছুখণ ধরে।
যিশুর জননী এখানে আসিয়া দাঁড়াক গাছের তলে,
বৃন্দাবনের যশোদা আসুক গোপাল লইয়া কোলে ;
ফাতিমা জননী আসুক বুকেতে ইমাম হোসেন টানি ;
দেখে যাক্ এই নির্জ্জন বনে মমতার ছবিখানি।

ধীরে ধীরে ধীরে কুয়াসা আঁধার মুছিল রবির গায়,
বিহগকুসুম সহস্রস্বরে ফুটিল বনের ছায়।
গাছের পাতার ফাঁকা পথ দিয়ে রবির আলোর ঢেলা ;
ঘুমন্ত এই স্নেহপুরী মাঝে জুড়িল নিঠুর খেলা।
ধীরে ধীরে তারা জাগিয়া উঠিল, ছেলেরে স্কন্ধে করি,
আহারের খোঁজে চলিল জননী শাখাপথগুলি ধরি।
চলে দম্পতি ডাল হতে ডালে হাতে ধরি পাকা ফল,
এ ওরে খাওয়ায় গান করে আর নেচে ফেরে চঞ্চল।
বৃদ্ধ এ বট, শূন্য বুকেতে কত কি যে কথা ভরে,
উতল বাতাসে কারে কি কহিছে বুঝি ফিস ফিস করে।

চাষীর মেয়ে

কলমীর ফুল রাঙা দুটি ঠোঁটে, ছড়াইছে হাসিধারা,
কাজল বিহীন কালো দুটি চোখে ভুরুতে কাজল পারা।
তুধালী ফুলের মত মুখখানি মায়াবী জোছনামাখা,
কত স্নেহ আর মমতা তাহার সোনার অঙ্গে আঁকা।

নিবিড় সবুজ ঘেরা বাঁশ-বন, তাহার শীতল ছায়,
ঘুঘু দম্পতি কণ্ঠ ছাড়িয়া উদাস নয়নে গায়।
তারি তল দিয়ে চলিতে চলিতে সোনার অঙ্গ ছেয়ে,
কি এক উদাস নিবিড় মায়া যে কাঁদিছে জীবন পেয়ে।

জাঙলা ভরিয়া সীম-লতা আর ছিরি-চন্দন-লতা,
প্রতিদিন ওরে শিখায় যতনে মায়া মমতার কথা।
বড় দুটি চোখ, জীবন্ত দুটি গ্রাম্য দীঘির মত,
গহন বনের নিবিড় পাতার ছায়া তরঙ্গে ক্ষত।

মলিন ছিন্ন শত-তালী-দেওয়া বসনে বাঁধিয়া তারে,
হায় হায় কেবা বন্দী করিল অভাবের কারাগারে!

কন্যা-সাজানী সিমলতা

কন্যা-সাজানী সিমের জাঙলা ভরিয়া ধরেছে ফল,
লাল নীল পাতা লতায় জড়ায়ে ফুটায়েছে ফুলদল।
এ বাড়ীর বউ শাড়ীর রঙের আকর্ষণেতে ধরি,
সুদূর নীলের তেপান্তরের মায়া আনিয়াছে হরি।
তাহার উপরে লাল সিমগুলি এ ওরে জড়ায়ে লয়ে,
শীতের রৌদ্রে ঝিক্ মিক্ করে স্বপনের কথা কয়ে।
নীল কবুতর আকাশ ভুলিয়া উড়িছে জাঙলা পরে,
সিমগুলি যেন তাহাদের কেউ এই কথা মনে করে।

কন্যা-সাজানী সিম-লতা তোর কে রেখেছে এই নাম ;
জাঙলা-জড়ান মায়া মমতার কাহিনী যে হেরিলাম।
কোন্ সে চাষীর লাল টুক্‌টুকে কন্যাটি সাজাইতে,
কোন্ রাখালের বাঁশীতে ভুলিয়া এসেছিলি ধরণীতে ;
অথবা সে কোন্ চাষীর রূপসী, গয়না অভাবে হায়,
সোহাগে আদরে তোমার লতারে পরেছিল সারা গায় ;
সেই হতে তব নাম যে হইল কন্যা-সাজানী লতা,
কত একতারা মুখর হয়েছে বর্ণিয়া সে বারতা।
লতায় লতায় জড়াজড়ি করি ফুলে ফলে হেলি ঢুলি,
পাতায় পাতায় মায়া মমতার সোহাগ উঠিছে তুলি।

কৃষাণ রাজার কন্যা কে যেন এই জাঙলার পরে,
সিম-লতা হয়ে ঘুমায়ে রয়েছে শত শত যুগ ধরে।
বাতাস আসিয়া বিলি দিতে দিতে তাহার দীঘল চুলে,
অতীত যুগের সে সব কাহিনী কয়ে যায় হেলে দুলে।

মরি মরি কিবা অপরূপ রূপ, লতার নীলাম্বরী,
কোন্ সে রূপসী কৃষাণীর তরে ছড়াল জাঙলা ভরি।
সে বউ কি আজো আসে নাই হেথা, কন্যা-সাজানী লতা,
পাতা আর ফুলে নক্সা বানায়ে তারি অপেক্ষারতা।
এ লতা শাড়ীর পাল উড়াইয়া ডিঙি নায়েতে তার,
কে কৃষাণ ভাসে শূন্যের গাঙে বউটিরে আনিবার।
পালের গায়েতে রঙিন ফুলের লিখেছে রঙিন চিঠি
কতকাল হতে চলিয়াছে যেন সেই কন্যার দিঠি।*

* পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা-ফরিদপুর অঞ্চলে কন্যা-সাজানী সিম-লতা দেখা যায়। এই সিমের পাতাগুলি লালে নীলে আর সবুজে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। তার উপরে রঙিন ফুল আর কচি কচি সিমের রঙে রামধনুকে পরাজিত করে। ঢাকা জেলার মাঝের চর গ্রামে এরূপ একটি সিমের জাঙলা দেখিয়াছিলাম।

কমলারাণীর দীঘি

কমলারাণীর দীঘি ছিল এইখানে
ছোট ঢেউগুলি গলাগলি ধরি ছুটিত তটের পানে।
আধেক কলসী জলেতে ডুবায়ে পল্লীবধূর দল,
কমলারাণীর কাহিনী স্মরিতে আঁখি হত ছল ছল।
আজ সেই দীঘি শুকায়েছে, এর কর্দ্দমাক্ত বুকে,
কঠিন পায়ের আঘাত হানিয়া গরুগুলি ঘাস টুকে।
জলহীন এই শুষ্ক দেশের তৃষিত জনের তরে,
কোন্ সে নৃপের পরাণ উঠিল করুণার জলে ভরে।
সে করুণা-ধারা মাটির পাত্রে ভরিয়া দেখার তরে,
সাগর দীঘির মহা কল্পনা জাগিল মনের ঘরে।

লক্ষ কোদালী হইল পাগল, কঠিন মাটিরে খুঁড়ি,
উঠিল না হায় কল-জল-ধারা গহন পাতাল ফুঁড়ি।
দাও জল দাও কাঁদে শিশু মার শুষ্ক কণ্ঠ ধরি,
ঘরে ঘরে কাঁদে শূন্য কলসী বাতাসে বক্ষ ভরি।
লক্ষ কোদালী আরো জোরে চলে কঠিন মাটির থেকে,
শুষ্ক বালুর ধূলি উড়ে যায় উপহাস যেন হেঁকে।

"কোথায় রয়েছ ভাট ব্রাহ্মণ, কোথায় গণক দল,
জল্‌দী করিয়া গুণে দেখ কেন দীঘিতে ওঠে না জল?
আকাশ হইতে গুণিয়া দেখিও শত-তারা আঁখি দিয়া,
পাতালে গুণিও বাসুকি-ফণার মণি-দীপ জ্বালাইয়া।
ঈশানে গুণিও ঈশানী গলের নর-মুণ্ডের সনে,
দক্ষিণে গণো, শাহ্‌ মান্দার সেথা সুন্দর বনে।"
আকাশ গণিল পাতাল গণিল, গণিল দশটি দিক,
দীঘিতে কেন যে জল ওঠে নাক বলিতে নারিল ঠিক।

নিশির শয়নে জোড়মন্দিরে স্বপন দেখিছে রাণী,
কে যেন আসিয়া শুনাইল তারে বড় নিদারুণ বাণী;
"সাগর দীঘিতে তুমি যদি রাণি! দিতে পার প্রাণ দান,
পাতাল হইতে শত-ধারা মেলি জাগিবে জলের বান।"
স্বপন দেখিয়া জাগিল যে রাণী, পূবের গগন-গায়,
রক্ত লেপিয়া দাঁড়াইল রবি সুদূরের কিনারায়।
"শোন শোন ওহে পরাণের পতি! ছাড় গো আমার মায়া,
উড়ে চলে যায় আকাশের পাখী পড়ে রয় শুধু ছায়া।"

পেটরা খুলিয়া তুলে নিল রাণী অষ্ট অলঙ্কার,
রাসমণ্ডল শাড়ীর লহরে দেহটি জড়াল তার।
কৌটা খুলিয়া সিঁদূর তুলিয়া পরিল কপাল ভরি,
দুর্গা প্রতিমা সাজিল বুঝি বা দশমীর বাঁশী স্মরি।
ধীরে ধীরে রাণী দাঁড়াইল আসি সাগর দীঘির মাঝে,
লক্ষ লক্ষ কাঁদে নরনারী দাঁড়ায়ে তটের কাছে।

পাতাল হইতে শতধারা মেলি নাচিয়া আসিল জল,
রাণীর দুখানা চরণে পড়িয়া হেসে ওঠে খল খল।
খাড়ু জলে রাণী খুলিয়া ফেলিল পায়ের নূপুর তার,
কোমর জলেতে ছিঁড়িল যে রাণী কোমরে চন্দ্রহার।
বুক জলে রাণী কণ্ঠ হইতে গজমতি হার খুলে,
কোলের ছেলেটি জয়ধর কোথা দেখে রাণী আঁখি তুলে।
গলাজলে রাণী খোঁপা হতে তার ভাসাল চাঁপার ফুল,
চারিধার হতে কল জলধারা ভরিল দীঘির কূল।
সেই ধারা সনে মিশে গেল রাণী আর আসিল না ফিরে,
লক্ষ লক্ষ কাঁদে নরনারী আকাশ বাতাস ঘিরে।

*　　*　　*　　*

কমলারাণীর এই সেই দীঘি, কার অভিশাপে আজ,
খুলিয়া ফেলেছে অঙ্গ হইতে জল-কুমুদীর সাজ।
পাড়ে পাড়ে আজ আছাড়ি পড়ে না চঞ্চল ঢেউদল,
পল্লীবধূর কলসীর ঘায়ে দোলে না ইহার জল।
কমলারাণীর কাহিনী এখন নাহিক কাহারো মনে,
রাখালের বাঁশী হয় না করুণ নিশীথ উদাস বনে।
শুধু এই গাঁর নূতন বধূরে বরিয়া আনিতে ঘরে,
পল্লীবাসীরা বরণ কূলাটি রেখে যায় এর পরে।
গভীর রাত্রে সেই কূলাখানি মাথায় করিয়া নাকি,
আলেয়ার মত কে এক রূপসী হেসে ওঠে থাকি থাকি।

নমুর মেয়ে

নমুদের কালো মেয়ে
কালো তবু যেন কেউ দেখি নাই সুন্দরী তার চেয়ে।
কালো মেঘ তারে জড়ায়ে রয়েছে, নতুন রোদের গুঁড়া,
ছড়ায়ে ছড়ায়ে মেজেছে কে যেন সে মেঘের সব চূড়া।
বরণ-ডালার দুর্ব্বা-শীষের রঙ যেন তার গায়,
যেন বন-লতা পাতায় পুষ্পে হাসিছে তরুর ছায়।

নমুরা উঠানে কচি ধান রচে কার্ত্তিক পূজা তরে,
তেমনি উহারে রচিয়াছে যেন তাহাদের গেঁয়ো ঘরে।
কালো ছিপছিপে পাতলা গঠন হাত চোখ মুখ কান,
যেন ছোট গাছ লতা পাতা ফুলে সাজায়েছে দেহখান।
মেঘের মতন ঘন কালো কেশ চরণ ছুঁইতে চায়,
বাতাস কেবল হেলিয়া দুলিয়া বারণ করিছে তায়।
সে চুলের মাঝে কালো মুখখানি ঈষৎ সে কালো শশী,
যেন ছড়াইছে হাসিখানি তার ঘন কালো মেঘে পশি।
ঈষৎ সে কালো ভোমর বুঝি বা নিবিড় পাতার স্নেহে,
মজিয়া আজিকে ভুল করিয়াছে যাইতে ফুলের গেহে।
সেই কালো মুখে কালো দুটি চোখ, যুগল কমল নয়,
মৃগের নয়ন কতই দেখেছি কারো না এমন হয়।

তার কালো মুখে কালো দুটি চোখ, নমুদের গাঁর শেষে,
শ্যাম পুকুরের কাক-চোখ-জলে পদ্ম বেড়ায় ভেসে।
তাহারি মুকুরে ছায়া ফেলাইয়া তট-তরুগুলি নিতি,
বাতাসে দুলিয়া ফুল ছড়াইয়া পাখী সনে গায় গীতি।
আকাশ বুঝিবা বনেরে লুকায়ে তরুণ পাতার ফাঁকে,
সেই কালো জলে তাহার গায়ের কতকটা ছবি আঁকে।

তেমনি হয়ত তার চোখ দুটি গাঁয়ের দীঘির মত,
লহরে লহরে হেলিছে দুলিছে সে গাঁয়ের ছবি শত।
সেই চোখ দুটি, নহে সফরীর পদ্ম পাতারো নয়,
যুগল ভোমর কে দেখেছে কবে, সাঁঝ তারা কেবা কয়।
সেই দুটি চোখে তাদের গাঁয়ের কাজল বনের ছায়া,
বারোটি বছর ভরি দোলায়েছে কত না রূপের মায়া।
গাঁয়ের পাশেতে শস্যের খেত, বরণে বরণ ধরি,
আলপনা রেখা আঁকিয়াছে কত সেই চোখ দুটি ভরি।
সেই দুটি চোখে দেখিয়াছে সে যে নিবিড় পাতার ফাঁকে,
মাকালের ফল ঘন লাল হয়ে ঝুলিতেছে উঁচু শাখে।

ওর দুটি চোখে ওদেরই গাঁয়ের শ্যাম দীঘি যেন মেলা,
মুকুরে তাহার সারা গাঁওখানি করে ছায়া-চুরি খেলা।
তার পানে চেয়ে দেখা যায় যেন ঘন কালো গাছগুলি,
ফাঁকে আর ফাঁকে আকাশের নীল মেঘে মেঘে যায় দুলি।
সে নীলেরো পারে যেন কোন দেশ, স্বপ্নলোকের পারে,
যেন কি কুহেলী মায়া-মরীচিকা ডাকিয়া ফিরিছে কারে।
ওর কালো মুখে কালো দুটি চোখ যেন চেয়ে তার পানে,
নব আষাঢ়ের মেঘেদের ভাষা শোনা যায় কানে কানে।

বাহু দুটি তার কিছু বেশী সরু, লম্বাও যেন হবে,
তবু মনে হয় এমন না হলে মানাত না ওরে তবে।
গয়না এমন নাই কিছু গায়ে, কগাছি কাঁচের চুড়ি,
ওর সরু হাতে টুনটুন করে বাজিতেছে ঘুরি ঘুরি।
গায়ে জড়ায়েছে নীল শাড়ীখানি, গলায় পুঁতির হার,
এতেই উহারে মানায়েছে যাহা তুলনা নাইক তার।
হীরা মণি দিয়ে কেউ যদি ওর জড়াইত দেহখান,
তাহাতে উহার বাড়িত না রূপ হত শুধু অপমান।
নমুদের মেয়ে পাড়াগাঁয়ে থাকে উহার জগৎখানি,
ওদের গাঁয়ের চেয়ে বড় নয় এ খবর মোরা জানি।

গোড়ই নদীর চর

গোড়ই নদীর চর,
নূতন ধানের আঁচল জড়ায়ে ভাসিছে জলের পর।
একখানা যেন সবুজ স্বপন একখানা যেন মেঘ,
আকাশ হইতে ধরায় নামিয়া ভুলিয়াছে গতিবেগ।
এখানে ওখানে বাবলার গাছ শাখার নিশান ধরি,
স্বর্গ হইতে যত রহস্য আনিছে হেলায় হরি।
রবির আলোরে বাধা দিতে হেথা আড়াল নাহিক কার,
বাতাসের গতি বন্ধ করিতে রচে নাই কেহ দ্বার।
সকালের রবি সকলের আগে এইখানে তাই আসে,
কাঁচা ধান পাতে কিরণ ঢালিয়া বাতাসের দোলে হাসে
চরের বিহগ ডানায় ধরিয়া এরি রহস্য কথা,
চক্র মেলিয়া উড়িয়া ফিরিছে আকাশের যথা তথা;
তারি বিনিময়ে সাঁঝ সকালের যত রং গোলা হয়,
সবটুকু তারা পাখায় পুরিয়া ছড়ায় এ চরময়।
মাটির এ নব স্বর্গ রচিয়া সুর কিন্নর তারা,
এ বালুচরের বক্ষে ছড়ায় ভাষাহীন সুরধারা।

দুপুরের রোদে আগুন জ্বালিয়া খেলায় নদীর চর,
দমকা বাতাসে বালুর ধূম্র উড়িছে নিরন্তর।

জাহান্নামের দুয়ার খুলিয়া বুঝিবা মৃতের দল,
ধূলার কাফন অঙ্গে জড়ায়ে করিতেছে কোলাহল।
স্বর্গ লোলুপ কোন সে দানব ধূসর ধূলির বেশে,
মর্ত্তের এই ইন্দ্রপুরীতে আগুণ জ্বালাল এসে।

রাতের বেলায় আঁধারের কোলে ঘুমায় নদীর চর,
জোনাকী মেয়েরা স্বপনের দীপ দোলায় বুকের পর।
শেষ রাত্রের জোছনার রথে পরীরা নামিয়া আসি,
শঙ্খ শামুক কুড়ায়ে কুড়ায়ে খেলায় হেথায় হাসি।
শিষ দিয়ে তারা ডাকে যেন কারে উদাসী ঝাউয়ের বায়ে,
দূরে বাঁশী বাজে স্বজন বিহীন চাঁদের একেলা নায়ে।
গোড়ই নদীর ঢেউগুলি বুঝি বুঝ মানিবেনা আর,
আছাড়িয়া পড়ে বালুকার পরে কি আশায় বার বার।

শেষরাত্র

আজিকের রাতে ঘুমাবোনা আর, পাখিরা ডাকিছে শাখে,
নেহারে নাহিয়া বনদেবী তার গায়েতে জোছনা মাখে।
দিগন্তজোড়া নীল গগনের তেপান্তরের মাঠে,
চাঁদের কুমারী ফেরে একাকিয়া ছায়াপথ ছায়া-বাটে।
তারাফুল তার ছিঁড়িয়া পড়েছে, আসমান-তারা শাড়ী,
গাঁয়ের গাঙেতে নাহিতে যাইয়া আসিয়াছে তারে ছাড়ি।

বনতলে আজ বাতাস নাচিছে, পাতার করাতে কাটি
চাঁদের আলোরে খণ্ড করিয়া উজল করিছে মাটি।
টুক্‌রো আঁধার হেলিয়া দুলিয়া কুড়ায় জোছনা-গুঁড়া,
গন্ধের মদে মাতাল বাতাস ভাঙিছে ফুলের চূড়া।
ভোরাই নদীতে ভাসিয়া চলেছে শুক-তারকার দীপ,
আকাশ-কুমারী মুছিল ভালের কনক-চাঁদের টিপ।
পূবের গগনে আসে রবিরাজ সপ্ত অশ্ব ছাড়ি,
হত-আঁধারের রক্তিম দেহ মর্দ্দিত পায়ে তারি!